গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৪ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ১ - ৭ জুন, ২০১২ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধি ঃ ধর্মঘট, অবরোধ, রেল রোকো সহ নানা ভাবে ৩১ মে প্রতিরোধ দিবস পালনের ডাক এস ইউ সি আই (সি)-র

পেট্রলের দানবীয় মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে ৩১ মে ধর্মঘট, অবরোধ, রেল রোকো সহ গণআন্দোলনের যে কোনও স্বীকৃত পদ্ধতিতে সারা ভারত প্রতিরোধ দিবসের ডাক দিয়েছে এস ইউ সি আই (সি)।

দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ পেট্রলের এযাবৎকালে সর্বাধিক মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়ে ২৪ মে এক বিবৃতিতে বলেন, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার চাতুরির সাহায্যে সংসদকে এড়িয়ে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের বিক্রয়মূল্যের তুলনায় এ দেশের বাজারে তেলের বিক্রয়মূল্য কম হওয়ায় তাকেই 'আন্ডার রিকভারি' নামে অভিহিত করে এ দেশের তেল সংস্থাগুলি লোকসানের ধুয়া তুলেছে। পাশাপাশি চূড়ান্ত অন্যায্য 'ইম্পোর্ট প্রাইস প্যারিটি' অনুসরণ করে দেশে উৎপাদিত তেলকে আমদানিকৃত তেলের সমান দামে বিক্রি করে দৈত্যাকার তেল কোম্পানিগুলি বিপুল লাভ করে।

ফলে, এই লোকসানের ধুয়া দেশের মানুষের সঙ্গে পরিষ্কার জালিয়াতি। এর ভিত্তিতেই সীমাহীন অর্থনৈতিক লুঠ-পাট ও মূল্যবৃদ্ধির বোঝায় পিষ্ট জনসাধারণের ঘাড়ে নতুন করে পেট্রলের দামের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমরা দেশের মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ৩১ মে সারা ভারত প্রতিরোধ দিবসে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলুন। এর জন্য ধর্মঘট, অবরোধ, রেল রোকো সহ গণআন্দোলনের স্বীকৃত যে কোনও পথই গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলে এই নিষ্ঠুর জনবিরোধী সরকারকে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে বাধ্য করতে হবে। আমরা আরও দাবি করছি জনসাধারণের পকেট কাটার জন্য পেট্রোপণ্যের উপর কেন্দ্র এবং সমস্ত রাজ্য সরকার যে কর এবং সেস বসিয়ে রেখেছে তা প্রত্যাহার করতে হবে। ডিজেল, রান্নার গ্যাসের আবারও মূল্যবৃদ্ধির যে প্রচেষ্টা চলছে আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করছি।

সর্বশক্তি দিয়ে এই মারাত্মক আক্রমণ প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত থাকার জন্য জনসাধারণের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি।

বিজেপি এবং শাসক একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অন্যান্য বিশ্বস্ত দলগুলি ছদ্ম প্রতিবাদের চমক দেখানোর জন্য ৩১ মে ভারত বনধের ডাক দিয়েছে। ভোটের বাজারে আখের গোছানোর লক্ষ্যে এদের এই প্রতিবাদ আসলে চালাকি ছাড়া কিছু নয়। এরা ক্ষমতায় থাকাকালীন একইভাবে জ্বালানির দাম বিনিয়ন্ত্রণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল, একই নীতি নিয়ে এরা সরকার চালিয়েছে।

এই দলগুলির ধূর্ত পদক্ষেপ যে শুধু সংকীর্ণ সংসদীয় রাজনীতিতে ফায়দা তোলার জন্যই তা

পাঁচের পাতায় দেখুন

২৬ মে দিল্লিতে বিক্ষোভ

ব্যয়সঙ্কোচের নামে পুঁজিবাদী সংকটের বোঝা জনসাধারণের ঘাড়ে চাপাচ্ছে সরকার

অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী ঘোষণা করেছেন, দেশজুড়ে যে আর্থিক সংকটের পরিস্থিতি চলছে, তার মোকাবিলার জন্য সরকার 'ব্যয়সঙ্কোচ' নীতি চালু করবে। বলেছেন, মানুষ পছন্দ করুন বা না করুন, এটা তাঁরা করবেনেই।

ব্যয়সঙ্কোচ মানে কী? তার মানে কি এই যে, বিপুল পরিমাণ যে সরকারি অপব্যয় মন্ত্রী-আমলাদের বিলাসব্যসন, বিদেশ ভ্রমণের পিছনে ঘটে চলেছে, প্রশাসনের স্তরে স্তরে চুরি-দুর্নীতিতে যে হাজার হাজার কোটি টাকা তছরূপ হয়ে চলেছে তা বন্ধ করা হবে? মন্ত্রী-আমলা-পুঁজিপতিদের যে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা দেশি-বিদেশি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রয়েছে তা উদ্ধার করা হবে? পুঁজিপতিদের যে বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স ছাড় দেওয়া চলছে, স্টিমুলাসের নামে যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা মালিকদের ভরতুকি দেওয়া হচ্ছে, তা বন্ধ হবে? না। এ সব একেবারেই নয়। এই ব্যয়সঙ্কোচের মানে, দেশের কোটি কোটি গরিব সাধারণ মানুষ, তাদের জন্য যে যৎসামান্য অর্থ শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবহণে-গণবণ্টনে-কৃষিতে-পরিষেবায় ব্যয় করা হয়ে থাকে, সেটুকুও বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এর ফল কী হবে?

হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা কমতে কমতে এখনও যতটুকু সাধারণ মানুষের জন্য জুটছে, সেটুকুও আর জুটবে না। রমরমা হবে বেসরকারি নার্সিংহোমের রক্তচোষা ব্যবসা। শিক্ষাক্ষেত্রেও একই পরিণতি ঘটবে। এমনিতেই সরকারি স্কুলগুলি সরকারের ভ্রান্ত শিক্ষানীতির পরিণামে উঠতে বসেছে, এবার আর্থিক সংকটের ধাক্কায় পুরোপুরি উঠে যাবে। রমরমা হবে বেসরকারি শিক্ষা-ব্যবসার। সারে সরকারি বরাদ্দ কমানোয় আগুন হবে সারের দাম। গরিব চাষি শেষ সম্বলটুকুও বেচতে বাধ্য হবে। ধুঁকতে থাকা রেশন ব্যবস্থার জীবনান্ত ঘটবে। চাকরিতে নিয়োগ বন্ধ হবে। বেকারত্ব গ্রাস করবে প্রতিটি পরিবারকে। অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা বন্ধ হবে। বিমা, পেনশন ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ এবং বিদেশি পুঁজির জন্য খুলে দেওয়া হলে অবসর জীবনে প্রবীণ নাগরিকদের ভিক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকবে না। এমনই মারাত্মক সব আক্রমণ একের পর এক নেমে আসবে।

সম্প্রতি তেলের অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধি সরকারি এই ব্যয়সঙ্কোচেরই নজির। বাড়তে চলেছে ডিজেল, রান্নার গ্যাস আর কেরোসিনের দামও। সরকার এই সমস্ত খাতে আর ভরতুকি দেবে না বলে ঘোষণা করেছে।

একই সরকারি নীতিতে দেশের ৯৯ শতাংশ সাধারণ মানুষের জন্য এক ব্যবস্থা, আর ১ শতাংশ মালিক পুঁজিপতিদের জন্য আর এক

ছয়ের পাতায় দেখুন

এর নাম ব্যয়সঙ্কোচ!

- রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের ২০০৭ সাল থেকে ১২ বার বিদেশ ভ্রমণের জন্য খরচ হয়েছে ২০৫ কোটি টাকা।
- লোকসভার স্পিকার মীরা কুমারের গত ৩৫ মাসে ২৯ বার বিদেশ ভ্রমণের জন্য খরচ হয়েছে ১০ কোটি টাকা।
- যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া গত ৭ বছরে বিদেশ ভ্রমণে খরচ করেছেন ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। ২০১১ সালের মে থেকে নভেম্বরের মধ্যে চারটি বিদেশ সফরে ১৮ দিন বিদেশে কাটানোর জন্য খরচ হয়েছে ৩৬ লক্ষ ৪০ হাজার ১৪০ টাকা। অর্থাৎ প্রতিদিন তাঁর পিছনে খরচ হয়েছে ২.০২ লক্ষ টাকা।
- 'হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে দেখানো হয়েছে এ সময়ে মন্ত্রী প্রফুল প্যাটেল গড়ে প্রতি ২৪ ঘন্টায় তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা করে বাড়িয়েছেন।

অথচ এই কর্তারাই দেশের গরিব মানুষের জীবনধারণের খরচ বেঁধে দিয়েছেন শহরাঞ্চলে দৈনিক ২৯ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলে দৈনিক ২৩ টাকা। এর বেশি ব্যয় করার ক্ষমতা থাকলে তিনি আর সরকারের কাছে গরিব বলে বিবেচিত হবেন না।

বি পি এল তালিকাভুক্ত করার দাবিতে মেয়রের দপ্তরে পরিচারিকারা

পরিচারিকাদের বি পি এল তালিকাভুক্ত করার বিষয়ে তাঁর কিছু করার নেই, ২৩ মে এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তৃণমূল পরিচালিত কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র। এদিন সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির কলকাতা জেলা শাখার পক্ষ থেকে পরিচারিকারা পাঁচ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দিতে গিয়েছিলেন। তাঁদের দাবিগুলির মধ্যে ছিল, পরিচারিকাদের বি পি এল কার্ড দিতে হবে ও খাদ্য সরবরাহ করতে হবে, পরিচারিকা সন্তানদের শিক্ষার যাবতীয় খরচ সরকারকে বহন করতে হবে, ষাটোর্ধ্ব পরিচারিকাদের বার্ধক্যভাতা প্রদান, বিধবা পরিচারিকাদের বিধবাভাতা প্রদান, সবেতন সাপ্তাহিক ছুটি ইত্যাদি। সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা বুলবুল আইচ বলেন, মেয়র জানিয়েছেন বিপিএল তালিকাভুক্ত করার দায়িত্ব সুবার্বান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (সুডা-র); অন্যান্য দাবিগুলি নিয়েও তাঁর কিছু করার নেই। মেয়রের বক্তব্য পরিচারিকাদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি করে। সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আগামী দিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

বেআইনি বাসভাড়া আদায়ের বিরুদ্ধে যাত্রী সুরক্ষা কমিটির আন্দোলনের জয়

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মন্দিরঘাট-লক্ষ্মীকান্তপুর রোডে আর টি এ অনুমোদিত ভাড়া তালিকা প্রকাশ না করে টাটা ম্যাজিক গাড়ি ইচ্ছামতো ভাড়া আদায় করে চলেছে দিনের পর দিন, বহন করে চলেছে অনুমোদিত সংখ্যার চাইতে অনেক বেশি যাত্রী, একেবারে ঠাসাঠাসি করে। ফলে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে যাত্রী দুর্ভোগ চরমে। এছাড়া রয়েছে বাসে বাসে রেষারেষি, যার পরিণামে কয়েকদিন আগে এক দুর্ঘটনায় একজন নিহত ও চারজন আহত হয়। এই অবস্থা নিরসনে ভুক্তভোগী জনসাধারণ যাত্রী সুরক্ষা কমিটি গড়ে তুলে আন্দোলনে নামে। পাথরপ্রতিমা বিডিও এবং কাকদ্বীপ এসডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়, রাস্তা অবরোধও করা হয়। আন্দোলনের চাপে বিডিও-র হস্তক্ষেপে টাটা ম্যাজিক কর্তৃপক্ষ দাবিগুলি মেনে নেয় এবং দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার জন্য ৩০ হাজার টাকা দিতে বাধ্য হয়। যাত্রী সুরক্ষা কমিটির সভাপতি বনবিহারী পাত্র এবং সম্পাদক পরিতোষ দে জানিয়েছেন, জনসাধারণের থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেও আহতদের চিকিৎসা করা হচ্ছে।

ডিজিটাল গণদাবী সংগ্রহ করুন

পার্টির লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত গণদাবী-র পুরনো সংখ্যার পৃষ্ঠাগুলি অনেক দিন হল এতটাই জীর্ণ হয়ে পড়েছে যে তা আর ব্যবহার করার অবস্থায় নেই। গণদাবী-র ঐতিহাসিক মূল্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। ফলে, স্থায়ী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। সেই অনুযায়ী এ কাজে দক্ষ ও নামী একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাদের সাহায্যে গণদাবী পত্রিকার ১৯৪৮ সালের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে ২০০২ সালে ৫৪ বর্ষ শেষ সংখ্যা পর্যন্ত সকল সংখ্যা ডিজিটাল করা হয়েছে অর্থাৎ প্রতিটি সংখ্যা পি ডি এফ ফরম্যাটে ফাইল করে ডি ভি ডি-তে তোলা হয়েছে। কম্পিউটারে এই ডি ভি ডি চালিয়ে যে কোনও বর্ষের যে কোনও সংখ্যা দেখা ও পড়া যাবে, প্রয়োজনে প্রিন্টও বের করা যাবে। এই ডি ভি ডি সহজে নষ্ট হবে না।

গণদাবী-র সম্পূর্ণ সূচিপত্র তৈরির কাজ চলছে, এখনও শেষ হয়নি। প্রায় ৮ হাজার পৃষ্ঠা ডিজিটাল করাতে খরচ হয়েছে ২ লক্ষ টাকা। এ কারণেই প্রতি ডি ভি ডি-র জন্য ৫ হাজার টাকা মূল্য নির্ধারণ করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। গণদাবী দপ্তরে যোগাযোগ করে দ্রুত এই ডি ভি ডি সংগ্রহ করুন।

গণদাবী পত্রিকার নতুন টেলিফ্যাক্স নম্বর ঃ (০৩৩)২২৬৫০২৭৬

প্রবীণ কর্মীর জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এস ইউ সি আই (সি) নামখানা লোকাল কমিটির বর্ষীয়ান কর্মী কমরেড মোবারক খাঁ গত ১৫ মে সকালে দ্বারিকনগর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। ১৯৮৪ সালে কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে তিনি সিপিএম ত্যাগ করে এস ইউ সি আই (সি)-তে যোগদান করেছিলেন। দক্ষিণ চন্দনপীড়ির বাসিন্দা, কমরেড খাঁ সাধারণ মানুষ ও দলের কর্মী-সমর্থকদের বিপদে-আপদে সর্বদা পাশে থাকতেন। দলের ঘোষিত কর্মসূচি, অথচ তিনি অংশগ্রহণ করেননি — এমনটি হওয়ার উপায় ছিল না।

কংগ্রেস ও সিপিএমের নানা অত্যাচারও তাঁকে দলের কাজ থেকে সরাতে পারেনি। দীর্ঘদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুর সাত দিন আগে ডায়মন্ডহারবারের নার্সিংহোম থেকে ফেরার সময় ছেলেদের বলেছেন, 'পার্টি অফিসে নিয়ে চলো, কমরেডদের সঙ্গে দেখা করে যাব।' অফিসে এসে বলেছেন, 'কমরেড, আমি তো কাজ করতে পারছি না, আপনারা ভালো করে কাজ করুন'।

তাঁর মৃত্যুসংবাদে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। কমরেডরা হাসপাতালে তাঁর মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান। ১৯ মে নামখানা পার্টি অফিসে কমরেড খাঁ-র স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড মোবারক খাঁ লাল সেলাম

জেলায় জেলায় মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের সভা

রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতিতে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়ন জেলায় জেলায় সভা করে চলেছে। ১২ মে মাথাভাঙার নজরুল সদনে দুই শতাধিক চালকের সামনে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সভাপতি সুজিত ভট্টশালী। সভায় চালকদের উপর পুলিশি হয়রানি বন্ধ করা ও লাইসেন্স পাওয়ার সমস্যা সমাধান সহ অন্যান্য দাবিতে আলোচনা করেন তিনি। সভা শেষে শহরে তাঁরা মিছিল করেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কোষাধ্যক্ষ জয় লোধ, জেলা সম্পাদক অনিল রায় বর্মন, মহকুমার সম্পাদক সাগর চৌধুরী ও সভাপতি প্রদীপ দে।

২১ মে মুর্শিদাবাদে অবস্থান বিক্ষোভে তিন শতাধিক চালকের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। মোটরভ্যান চালকদের পরিবহণ শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতির ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের টালবাহানার তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। জেলার বিভিন্ন থানার প্রায় শ'খানেক মোটরভ্যান কয়েকমাস ধরে আটক করে রেখেছে পুলিশ। এই হয়রানির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের জেলা সম্পাদক মোর্তুজ শেখ, অফিস সম্পাদক সামসুল আলম, এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সভাপতি আব্দুস সঈদ বক্তব্য রাখেন। রাজ্য সম্পাদক তাঁর বক্তব্যে ২৭-২৮ জুন সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন সফল করার আহ্বান জানান। জেলাশাসককে তাঁরা দাবিপত্র দেন।

সিউড়ি হাসপাতালে সুচিকিৎসার দাবি

১৮ মে বীরভূম জেলার সিউড়ি সদর হাসপাতালের দীর্ঘ দিনের অব্যবস্থার প্রতিবাদে ও পরিষেবা উন্নয়নের দাবিতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের বীরভূম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবি জানানো হয়, হাসপাতালে প্রতিদিন শল্যচিকিৎসককে থাকতে হবে, রোগীর অপারেশন দীর্ঘ দিন ফেলে রাখা চলবে না, ডিউটিরত এবং আউটডোর চলাকালীন চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করতে হবে, ৬০টি পোস্টের মধ্যে ২২টি শূন্যপদে প্রয়োজনীয় ডাক্তার নিয়োগ করতে হবে, রোগী কল্যাণ সমিতির টাকা যথাযথ খরচ করে তা জনসমক্ষে জানাতে হবে।

ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত। সংগঠনের জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আয়েষা খাতুন, স্বাতী পাল, কল্যাণ মণ্ডল, চৈতালী চক্রবর্তী, নমিতা দাস সহ ১৫০ জন জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী ও স্থানীয় নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতাল সুপার ডাঃ ঘোষ দাবিগুলি মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং প্রতিকারের জন্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা দেন।

ডেপুটেশনের আগে হাসপাতালের বাইরে পথপরিক্রমা ও সভা হয়। সরকারি স্বাস্থ্যনীতি ও বিশেষভাবে পিপিপি নীতির তীব্র বিরোধিতা করা হয়।

গরিব কয়েদিরা দুর্দশার শিকার পয়সাওয়ালারা রাজার হালে

বড় বড় দুর্নীতিতে অভিযুক্ত নেতা-মন্ত্রী অথবা প্রভাবশালী খুনের আসামীরা অনায়াসে প্যারোলে ও জামিনে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে, অথচ পুলিশ কোনও চার্জশিট দাখিল করতে না পারা সত্ত্বেও হাজার হাজার গরিব মানুষকে বিনা বিচারে জেলের ভেতরে পচে মরতে হচ্ছে বছরের পর বছর। এ ঘটনা শুধু এ রাজ্যে নয়, গোটা ভারতেই ঘটে চলেছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্যেই উঠে এসেছে এর জোরালো প্রমাণ।

২০০৯ সালের তথ্য অনুযায়ী ভারতে ৩ লাখ ৭৬ হাজার ৯৬৯ জন বন্দির মধ্যে ২ লাখ ৫০ হাজার ২০৪ (৬৬ শতাংশ) জন বিচারাধীন এবং এঁদের মধ্যে ২০০০ জনেরও বেশি ৫ বছর ধরে বন্দি। শিশুসহ ১১৯৬ জন মহিলা বিচারাধীন অবস্থায় বন্দি রয়েছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী এঁরা সকলেই সাধারণ বন্দি। ভারতে গত ১০ বছরে দিনে ৪ জনের বেশি মানুষ পুলিশ ও জেল হেফাজতে মারা গেছেন। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও ভয়াবহ। ২০১১ সালে লকআপে পুলিশি অত্যাচার ও অন্যান্য কারণে মারা গেছেন ৯৮ জন বন্দি। এমনও দেখা যাচ্ছে, কোনও কোনও অভিযুক্তের যথাসময়ে বিচার হলে দণ্ডবিধি অনুযায়ী তাঁর শাস্তির মেয়াদ যা হত, তার থেকে অনেক বেশি দিন বিচারাধীন অবস্থায় তিনি জেলে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ ডি এম কে-র কানিমোঝি, কংগ্রেসের সুখরাম, বিজেপি-র ইয়েদুরাপ্পা সকলেই বিলাসবহুল হোটেলে ছুটি কাটানোর মতো কিছুদিন জেলে কাটিয়ে বহাল তবিয়তে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

সম্প্রতি এমন সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে যে একজন ব্যক্তি ৩২ বছর বিনা বিচারে জেলে কাটানোর পরও তাঁর কেস কোর্টে ওঠেনি। ১৪ বছর জেলে কাটানোর পর জানা গেছে এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্দোষ। দরিদ্র পরিবারের নিতান্তই হতভাগ্য এই সব বন্দিদের পাশে দাঁড়ানোর মতো বা আর্থিক সাহায্য করার মতো কেউ নেই। ব্যক্তিগত জামিনে ছাড়া পেয়ে জেলের বাইরে গিয়ে অর্থ জোগাড় করে কোর্টে কেস তোলাও এদের পক্ষে দুরূহ হয়ে ওঠে। অথচ পুলিশ-প্রশাসনের উচ্চ মহলে মোটা ভেট দিয়ে রাঘব বোয়ালরা যে কোনও দুষ্কর্ম করেও অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রকৃত অপরাধীর বদলে দরিদ্র পরিবারের সাধারণ মানুষকে অপরাধী সাজিয়ে জেল খাটতে বাধ্য করা হচ্ছে, এমন উদাহরণও কম নয়। এ রাজ্যের বানতলা হত্যাকাণ্ডেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ।

উত্তরপ্রদেশের একজন শ্রমিক গত ৭ বছর ধরে অপহরণ ও খুনের দায়ে বিচারাধীন বন্দি হিসেবে রয়েছেন। হরিয়ানার এক প্রভাবশালী ব্যক্তি, দু'জনের নাম এক হওয়ার সুযোগ নিয়ে হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের পুলিশ মহলে প্রভাব খাটিয়ে তার বদলে ঐ শ্রমিককে গ্রেপ্তার করিয়েছে, নিজে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রকাশ্য দিবালোকে। একই ভাবে আলিগড় জেলায় বিত্তশালী ঠাকুরদাস সিং-এর ছেলে শেওরাজ সিং অপরাধ করেও জেলের বাইরে। তার পরিবর্তে আত্তার সিং-এর ছেলে দিনমজুর শেওরাজ সিং-কে জেল খাটানো হচ্ছে। এই দিনমজুরের স্ত্রী তাঁর স্বামীর মুক্তি চেয়ে আলিগড় থানায় বারবার দরবার করেও কোনও বিচার পাননি। সুপ্রিম কোর্ট আলিগড়ের এস পি এবং হরিয়ানার ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেলকে এই ঘটনার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে এবং অবৈধভাবে ৭ বছরেরও বেশি জেল খাটানোর জন্য বন্দির স্ত্রী সুনীতাদেবীকে ২৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দেয়। এই জাতীয় অন্যায় অবিচারের সংখ্যা ভুরি ভুরি।

চুরি, দুর্নীতি, প্রতারণা, জালিয়াতি প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজকর্মে ধনী শিল্পপতিমহল এবং সরকার ও প্রশাসনের উচ্চমহলের লোকজন যুক্ত থাকলে অনেক সময় নামমাত্র শাস্তি হলেও অর্থের জোরে বা প্রভাব খাটিয়ে তারা জামিন পেয়ে যায় সহজেই। যেমন কলকাতার এক ভুজিয়া ব্যবসায়ী খুনের দায়ে অল্প কিছুদিন জেলে আটক থাকার পরই জামিনে মুক্ত হয়ে গেল। আমরি হাসপাতালের ঘটনাতেও তাই দেখা গেল। অভিযুক্ত কোনও দরিদ্র মানুষ জামিন পাওয়ার জন্য ভালো আইনজীবী দূরে থাক সাধারণভাবে মামলা লড়ার খরচ জোগাড় করতেই অপারগ। তার উপর বিচার প্রক্রিয়া চলে বছরের পর বছর ধরে। আত্মপক্ষ সমর্থন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। যে কারণে সামান্য পারিবারিক বিবাদ বা ছোটখাটো চুরির অভিযোগে আটক ব্যক্তিকে বিচারাধীন অবস্থাতেই কাটাতে হয় দীর্ঘ সময়। ঘটনাটির বিচার হলে তার অনেক দিন আগেই সেই ব্যক্তি হয়ত মুক্তি পেতে পারতেন। দিনের পর দিন জেল থেকে বন্দিদের আদালতে আনা হয়, আবার কেস না ওঠায় তাঁদের জেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্ষুধার্ত শিশু কোলে বন্দির পরিজন শুধু দেখেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কত পরিবার শুধু এজন্যই সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

ধনী-গরিবের ফারাক এ দেশের প্রতিটি জেলের অভ্যন্তরে অত্যন্ত প্রকট। রাঁচির বিরসা মুন্ডা জেলে বিলাসবহুল হোটেলের মতো বিজ্ঞাপন দেওয়া থাকে। চলে 'ফেলো কড়ি মাখো তেল' নীতি। থাকার ব্যবস্থা, খাওয়া-দাওয়া থেকে আরাম-আয়েশ সবই মিলবে মোটা টাকার বিনিময়ে। ৩০০০-১০,০০০ টাকার বিনিময়ে থাকার এলাহি ব্যবস্থা, তিনবেলা খাওয়ার বন্দোবস্তের জন্য ২০০০-৫০০০ টাকা এবং অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য ৫০০-১০০০ টাকা ধার্য। পয়সাওয়ালা বন্দিদের জন্য চিকেন কারি, রুটি এবং শোয়ার জন্য গদি আঁটা পালঙ্ক। অপরদিকে সাধারণ বন্দিদের জন্য পোকায় কাটা কম্বল, খাবার হিসেবে জলের মতো ডাল ও কালো রুটি বরাদ্দ। পয়সাওয়ালা বন্দিদের হাতের নাগালে মদ, গাঁজা হেরোইন, তাস, রেডিও, মোবাইল সহ ভোগবিলাসের রকমারি উপাদান। অথচ জেলকর্তাদের পরিদর্শন রিপোর্টে এগুলির বিন্দুমাত্র উল্লেখ থাকে না। এ সবের কোনওটাই খুঁজে পায় না পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষ। জেলে বসানো ক্লোজড সার্কিট টিভি এবং জ্যামারগুলি বিশেষ বিশেষ অংশে বন্ধ থাকে। তাতে ধরা পড়ে না এদের কার্যকলাপ।

এ রাজ্যের জেলগুলির বন্দিদের নিত্য দিনের যন্ত্রণাও দেশের আর পাঁচটা জেলের মতোই। ওয়ার্ডগুলি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। চারপাশে ড্রেনগুলিতে ময়লা আবর্জনা, জল জমে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। জলনিকাশি ব্যবস্থা বন্ধ। আলো-পাখার সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। মশা-মাছির ভয়ঙ্কর উপদ্রব। বৃষ্টিতে ছাদ থেকে জল চুঁইয়ে পড়ে। স্বল্প পরিসরে ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয় বন্দিদের। খাবার নিম্নমানের, পরিমাণও অত্যন্ত কম। চিকিৎসার অভাব প্রকট। নিম্নমানের ওষুধের জন্য রোগ সারে না, বাইরে অন্য হাসপাতালে অসুস্থ বন্দিদের নিয়ে যাওয়ার মতো গাড়িরও ব্যবস্থা নেই। এর উপর আছে সাধারণ বন্দিদের প্রতি কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত ঔদাসীন্য। ফলে প্রতি মাসে ১-২ জন বন্দি মারা যায় শুধু উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে।

প্রতি ভিআইপি বন্দির সেবার জন্য সাধারণ বিচারাধীন বন্দিদের মধ্য থেকে সাত জন করে ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হয়। পায়খানা পরিষ্কার, ঘর মোছা, ড্রেন পরিষ্কার থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ করতে এদের বাধ্য করা হয়। জেলের বন্দিদের বয়ানে জানা যায়, কর্তৃপক্ষ বন্দিদের মধ্যে বিভাজন নীতি বজায় রাখতে 'রাইটার্স ' নামক একদল তল্পিবাহী নিয়োগ করে, যারা বন্দিদের হুকুমমতো চালানোর চেষ্টা করে, না হলেই চলে লাথি, ঘুষি, চড়-থাপ্পড়, গালাগালি। বন্দিদের মধ্য থেকে কর্তৃপক্ষ তাদেরই ঠিক করে, যারা কর্তৃপক্ষের কথা অনুযায়ী চলবে। এরা অন্য বন্দিদের ভয় দেখিয়ে, শাসানি দিয়ে প্রচুর টাকা তোলে। ভালো খাবার ও শোয়ার ব্যবস্থা করার অজুহাতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে জোর খাটিয়ে। খবরদারিও চলতে থাকে জেল কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। এতে জেল কর্তাদেরও লাভ। মাসিক মাইনে ছাড়াও উপরি আদায় হয়। রাইটার্স ও মেটদের তোলাবাজি চলে নির্বিঘ্নে। জেল ইউনিয়ন, সুপার ও জেলর এসব দেখেও দেখতে পান না। সামান্য প্রতিবাদ জানালেও বন্দিদের উপর নেমে আসে নির্মম অত্যাচার। একাধিক রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট ইউনিয়ন থাকলেও টাকা তোলার ক্ষেত্রে এরা সকলেই এক। নামে সংশোধনাগার হলেও চুরি, দুর্নীতি, লাম্পট্যের আখড়া হয়ে জেল পড়ে আছে সেই পুরনো মধ্যযুগীয় অবস্থাতেই। একদিকে পরিবার-পরিজন ছেড়ে থাকার কষ্ট, অন্যদিকে জেলের পঙ্কিল পরিবেশ বন্দিদের মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়।

ধনী-গরিবে প্রবল বৈষম্যে ভরা এই সমাজে জেলগুলিতেও বৈষম্যের অন্ত নেই। বিনা বিচারে জেলে পচে মরা যেন গরিব মানুষগুলির ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ অর্থবানরা অন্যায় করেও পার পেয়ে যাচ্ছে। ন্যায়বিচার হার মানছে পাহাড়প্রমাণ অর্থের কাছে, আর অন্যায় না করে বা পরিস্থিতির চাপে অন্যায় করতে বাধ্য হয়ে মৃত্যুদণ্ডের মতো কঠিন দন্ডাজ্ঞাও নেমে আসছে হতভাগ্য দরিদ্র বন্দিদের উপর। এর পরেও কি বলা যায় — এ দেশে আইন, বিচার সকলের জন্যই সমান?

আমেরিকার প্রাইভেট প্রিজন করপোরেশন—দাস ব্যবসার আধুনিক রূপ

মার্কিন দেশে আজ এমনকী কারাগার চালানোর দায়িত্বও নানা বেসরকারি কোম্পানির হাতে। এদের মধ্যে সর্ববৃহৎ কোম্পানির নাম 'কারেকশনস করপোরেশন অফ আমেরিকা'। নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জেও ২৫ কোটি ডলার মূলধনের মালিক হিসাবে এদের নাম নথিভুক্ত রয়েছে। সম্প্রতি এরা ব্যবসা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নতুন করে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে তারা সে দেশের ৪৮টি রাজ্যের কারাগারগুলি কিনতে চেয়ে ঐসব রাজ্যের কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। তাতে তাদের লাভের পরিমাণ নিশ্চিন্ত করতে তারা শর্ত দিয়েছে, কর্তৃপক্ষকে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে তাদের কেনা কারাগারগুলি সর্বদা অন্তত ৯০ শতাংশ ভর্তি থাকে। এর অর্থ হল দেশে অপরাধ বাড়িয়ে যেতে হবে বা বৃদ্ধির অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে, অথবা মিথ্যা অভিযোগে হলেও মানুষকে জেলে ঢোকাতে হবে, যাতে জেলখানা সর্বদা ভরা থাকে। তার উপর তারা দাবি করেছে, তাদের সাথে রাজ্যগুলির এই সংক্রান্ত চুক্তির মেয়াদ অন্তত ২০ বছর করতে হবে, যাতে বন্দিপিছু খরচের জন্য সরকার থেকে যে বরাদ্দ দেওয়া হবে, তা থেকেও তাদের যথেষ্ট লাভ উঠে আসে।

গত ২ বছরে আমেরিকার কারাগারগুলিতে বন্দির সংখ্যা সামান্য হ্রাস পেয়েছে। তাতে এইসব কোম্পানিগুলি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তারা বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিস্থিতিতে তাদের ব্যবসার যথেষ্ট বৃদ্ধি আশা করেছিল। তারা এখন আর শুধু কারাগারগুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট নয়, তারা সেগুলি কিনে নিতে চাইছে। এর ফলে, তাদের আশা, কারাগারগুলিতে বন্দিদের রাখার খরচের হার স্থির করার বিষয়ে অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে যাওয়ার বদলে তারা নিজেরাই একচেটিয়াভাবে ইচ্ছেমতো এই খরচ কম করতে পারবে, ফলে নিশ্চিত পরিমাণ লাভ অর্জন করা সম্ভব হবে। ঠিক যেমন পেন্টাগনের সাথে চুক্তিমতো অস্ত্র-উৎপাদনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া অস্ত্র-ব্যবসায়ীরা করে থাকে।

এইসব বিনিয়োগকারীরা আমেরিকার নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের সঙ্গে যেসব ফাইল বিনিময় করেছে তা পড়লে একমাত্র পূর্বতন দাস-ব্যবসায়ীদের কথাই মনে পড়ে। সেখানে তারা রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে বলেছে যে, যদি বন্দির সংখ্যা হ্রাস পায় তবে লাভ কমে যেতে পারে। ফলে বিশ্বের বৃহত্তম পুলিশি রাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের ধারা বজায় রাখতে হবে। দমনমূলক বিভিন্ন আইন কোনওভাবেই শিথিল করা চলবে না, প্যারোলে মুক্তি বা কারাবাসের নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে কঠোরতা বজায় রাখতে হবে। কতকগুলি ক্ষেত্রে যেসব কাজ আগে অপরাধমূলক বলে গণ্য হত সেগুলিকে এখন অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার যেসব দাবি উঠেছে, তাতে সরকারের কান দেওয়ারও কোনও প্রয়োজন নেই। এইসব করপোরেশনের ভাষায়, বে-আইনি অনুপ্রবেশ, বিভিন্ন ড্রাগের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শিথিলতার ফলে গ্রেফতারি, কারাদণ্ড ও বন্দির সংখ্যা হ্রাস পেতে পারে ও তাদের লাভের পরিমাণ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সে কারণে তাদের বক্তব্য, এইসব ক্ষেত্রে কোনও রকম শিথিলতা দেখানো চলবেনা।

বোঝাই যায়, মানবাধিকার বা মানুষের 'স্বাধীনতা' শব্দটি কতটা মূল্যহীন এইসব মুনাফাবাজ কোম্পানির কাছে। একজন মানুষ হল তাদের কাছে কেবলই একটি সংখ্যা, যাকে এবং যার শ্রমকে কাজে লাগিয়ে ও বিক্রি করে তারা কেবল লাভ করতে চায়। আর মার্কিন দেশের চোরা বর্ণবিদ্বেষের প্রেক্ষাপটে এর শিকার অবশ্যই বেশি পরিমাণে কৃষ্ণাঙ্গ ও অন্যান্য অশ্বেতাঙ্গ মানুষ। সে দেশের কারাগারগুলির উপচে পড়া বন্দিদের মধ্যেও তাই তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু

আটের পাতায় দেখুন

এতই যদি লোকসান দেশে বিদেশে তেল কোম্পানিগুলোর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠছে কী করে

আন্তর্জাতিক বাজারে যেদিন অশোধিত তেলের দাম সাম্প্রতিককালের মধ্যে প্রায় সর্বনিম্ন, সেদিনই কেন্দ্র যে হারে পেট্রলের দাম বাড়াল তা স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে ইতিপূর্বে হয়নি। দেশের মানুষের কাছে এ এক অদ্ভুত পরিহাস। সরকার যখন পেট্রলের দাম নির্ধারণকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে খোলা বাজারের উপর ছেড়ে দেয়, তখন বলেছিল আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লে এখানে দাম বাড়বে, কমলে কমবে। এবারে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম সেই মার্চ মাস থেকে সমানে কমছে, কিন্তু সরকার দাম কমায়নি। উল্টে বলছে, এতদিন রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় তারা নাকি দাম বাড়াতে পারেনি। কারণ

মুজফ্‌ফরপুর

তখন পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন ছিল। কিন্তু প্রশ্ন, বিশ্ববাজারে দাম যখন কমছে, এ দেশে তখন দাম বাড়বে কেন? তাহলে দাম বাড়ানোটাই সরকারের দস্তুর! এখন বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম কম হওয়ায় সরকার অন্য যে 'যুক্তি' দেখাচ্ছে, তা হল, ডলারের তুলনায় টাকার দাম দ্রুত পড়ে যাওয়ায় তেল কোম্পানিগুলোর তেল আমদানির ব্যয় বেড়ে গেছে। ফলে তা পুষিয়ে দিতে দাম না বাড়িয়ে উপায় নেই।

কিন্তু প্রণব মুখোপাধ্যায় তো এই কিছুদিন আগেই উচ্চস্বরে বলেছিলেন, ভারতীয় অর্থনীতির ভিত অত্যন্ত মজবুত। পৃথিবী জুড়ে

বোকারো

যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে, তার ধাক্কা নাকি ভারতীয় অর্থনীতির গায়ে পড়বে না। তাহলে এখন গেল গেল রব তোলা হচ্ছে কেন? তাছাড়া বাজারে ডলারের জোগান দ্রুত বাড়িয়েই তো টাকার বিনিময় মূল্যের অবনমন আটকানো যায়। সে পথে না গিয়ে সরকার পেট্রলের দামবৃদ্ধির সহজ রাস্তা নিল। যার ফল শেষপর্যন্ত ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। পেট্রলের দাম বাড়ছে। ডিজেল, কেরোসিন, রান্নার গ্যাস সহ সব জিনিসের দাম আবার বৃদ্ধি শুধু সময়ের অপেক্ষা। শোনা যাচ্ছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য

জামসেদপুর

নাকি এটা আপাতত স্থগিত থাকছে। তার পরেই ঝুলি থেকে বার করা হবে।

আসলে পেট্রলের দাম বাড়লে রাজকোষে বিপুল পরিমাণ আয় হয়। তাই প্রতিবার পেট্রলের দাম বাড়ানোর আগে সরকার রাজকোষ ঘাটতির কাঁদুনি গাইতে থাকে। এবারেও তাই। মনমোহন সরকার রাজকোষ ঘাটতিতে রাশ টানছে, সংস্কারের পথে হাঁটতে চাইছে — এই বার্তা দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের দেওয়া জরুরি ছিল বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম আর্থিক উপদেষ্টা এম গোবিন্দ রাও। পেট্রল, ডিজেল কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের অন্যতম উৎস। পেট্রলিয়াম মন্ত্রী লোকসভাতেই কিছুকাল আগে জানান যে, পেট্রোপণ্যের বাজার দামের প্রায় ৫৫ শতাংশই হচ্ছে কেন্দ্র ও সরকারগুলির কর ও সেস। অর্থাৎ খোলাবাজারে পেট্রল, ডিজেলের যে দাম ধার্য হয় তার অর্ধেকের কাছাকাছি কেন্দ্র এবং রাজ্যের ট্যাক্স। রাজকোষ ভরতি হচ্ছে জনগণের পকেট কেটে। কিন্তু সেই টাকা কোথায় যাচ্ছে? মন্ত্রী, আমলা, সাংসদ পুষতে খরচ হচ্ছে, দুর্নীতির চোরাস্রোতে বেরিয়ে যাচ্ছে। রাজকোষে ঘাটতি, অথচ রাষ্ট্রপতির বিদেশ ভ্রমণে লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। ১৬ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা হয়ে যাচ্ছে সাংসদদের মাইনে। মালিকদের ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি সংসদে ভোডাফোন সংস্থাকে ছাড়া হবে না ঢাক পিটিয়েও তার কাছ থেকে পাওনা টাকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কয়েক লক্ষ কোটি।

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের আমল থেকেই রাজ্য সরকার ট্যাক্সের বাইরে লিটারে ১ টাকা সেস নিয়ে যাচ্ছে। সরকার সেস নিচ্ছে যে পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা বলে, দেখা গেছে সেই খাতে এত দিনের সেস বাবদ সংগৃহীত অর্থ কোনও কাজেই আসেনি। তাহলে সেস নেওয়া হচ্ছে কেন। অবিলম্বে এই সেস প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত বর্তমান রাজ্য সরকারের।

মালিকদের পেটোয়া সংবাদমাধ্যমগুলি ভর্তুকির গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে জনগণের। কেন্দ্রীয় সরকারের রাজকোষ নাকি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে জনগণকে ভর্তুকি দিতে দিতে। অথচ হিসেবে দেখা গেছে, শুধু পেট্রোপণ্য থেকে যে পরিমাণ ট্যাক্স আদায় করা হয়, জনস্বার্থে দেওয়া ভরতুকির টাকা তার চেয়ে কম। পেট্রোপণ্য থেকে সরকারের যা আয় হয় তার মাত্র দেড় শতাংশ কেরোসিন তেল এবং রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি দেয় সরকার। অথচ সরকার যুক্তি দেয় কেরোসিন এবং রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি দিতে হয় বলেই পেট্রলের দাম না বাড়িয়ে উপায় নেই।

তেল কোম্পানিগুলো 'আন্ডার রিকভারির' গল্পও শোনাচ্ছে। বাস্তবে অপরিশোধিত তেল বিদেশ থেকে এনে দেশে শোধন করে বাজারজাত করার প্রক্রিয়ার মধ্যে এবং তার দাম নির্ধারণ করার মধ্যে বহু রকমের অস্বচ্ছতা আছে। এই নিয়ে বহু প্রশ্নও আছে। রিলায়েন্স থেকে শুরু করে বহুজাতিক তেল সংস্থাগুলো সিঙ্গাপুর, দুবাইতে যে দামে পেট্রল বিক্রি হয় সেই দামের সাথে তুলনা করে ক্ষতি দেখায়। এদেশে উৎপাদন খরচের উপর ৩০ শতাংশ লাভ রেখে কোম্পানিগুলো তেল বিক্রি করলে তাদের পেট্রলের দাম যদি ৭৫ টাকা লিটার হয়, আর অন্যান্য দেশে কোম্পানিগুলো যদি তাদের উৎপাদন খরচের উপর ৩০ শতাংশ লাভ রেখে বাজারে তেলের দাম ১০০ টাকা ধার্য করে, তাহলে আন্তর্জাতিক দামের তুলনায় ২৫ টাকা ক্ষতি হচ্ছে বলে ভারতীয় কোম্পানিগুলো দেখায়। একেই তারা আন্ডার রিকভারি বলছে। এর মধ্যেও মিথ্যাচার আছে। কারণ, ভারতীয় কোম্পানিগুলো বিশ্ববাজার থেকে শোধিত তেল আমদানি করে না, অশোধিত তেল (ক্রুড) আমদানি করে ভারতে শোধন করে। কিন্তু দামের তুলনার সময় বিদেশের বাজারে শোধিত তেল বিক্রির দামটা দেখায়। এভাবেই এদেশের তেল কোম্পানিগুলো বিপুল লাভ গোপন করে ক্ষতির গল্প শোনায়। ২০০৭-০৮ সালের তেল কোম্পানিগুলির প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন-এর লাভ হয়েছিল ৭৯১২.৪ কোটি টাকা, কিন্তু তারা আন্ডার রিকভারি দেখিয়েছে ৯৭৭৪ কোটি টাকা। হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম-এর লাভ হয়েছে ১৩৬৪.১ কোটি টাকা, ভারত পেট্রোলিয়ামের ১৭৬৯.৫ কোটি টাকা। কিন্তু তারাও আন্ডার রিকভারির গল্প শুনিয়েছে। আর মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স-এর লাভ তো আকাশ ছোঁয়া। ২০১০-১১ আর্থিক বর্ষে লাভ করেছে ২০,২৮৬ কোটি টাকা। কোথায় ক্ষতি? ক্ষতি তো নেই-ই, বরং উল্টে তেল কোম্পানির আন্ডার রিকভারির কাঁদুনিতে সরকার বিগলিত হয়ে তাদের দু'হাত ভরে ভর্তুকি দিচ্ছে। দিচ্ছে কোথা থেকে? যে টাকা জনগণের পকেট কেটে ট্যাক্সের নামে তুলছে, সেই

গুজরাটের সুরাট

টাকাতেই মালিকদের পকেট ভরে দিচ্ছে। হিসাবে দেখা গেছে ২০১০-১১ আর্থিক বর্ষে সরকার তেলের দাম বাড়িয়ে আয় করেছে ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা, আর তেল কোম্পানিগুলিকে ভর্তুকি দিয়েছে ৫৩ হাজার কোটি টাকা। তাই প্রশ্ন, কে কাকে ভর্তুকি দিচ্ছে? লোকসানের গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে দেশের সরকার মালিকের পকেট ফুলে ফেঁপে ওঠার সুবন্দোবস্ত করে দিচ্ছে, আর মালিকরা তাদের ব্যবসা বাড়িয়ে মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, লিবিয়া, আফ্রিকার দেশে দেশে তেলের খনি কিনছে। আর সরকারও কোষাগার ঘাটতি

হায়দ্রাবাদ

কমাবার জন্য লাগাতার পেট্রোপণ্যের দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে। কারণ দাম যত বাড়বে, সেই অনুপাতে সরকারি ট্যাক্সের টাকাও বাড়বে। আমাদের দেশ সত্তরের দশকের শেষ দিকে খনিজ তেলে প্রায় স্বয়ম্ভর হয়ে উঠ ছিল। কিন্তু খনিজ তৈল ক্ষেত্রকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া শুরু করে সরকার। তারা আভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে আরও না বাড়িয়ে আমদানির উপর নির্ভর করতে শুরু করে তাদের ব্যবসার স্বার্থে। বর্তমানে ৭৫ শতাংশের বেশি অপরিশোধিত তেল ভারতে আমদানি করা হয়। প্রয়োজনের বাকি

পাটনা

যে ২৫ শতাংশ দেশীয় উৎপাদন থেকে মেটানো হয়, সেখানেও লাভের ছড়াছড়ি। মালিকদের আবদার অনুযায়ী এক্ষেত্রেও চালু আছে ইমপোর্ট প্রাইস প্যারিটি বা আমদানি দামের সমতা নীতি। যার অর্থ আমদানি করা তেল যে দামে ভারতে বিক্রি হবে, দেশে উৎপাদিত তেলও সেই দামে বিক্রি হবে। এই পথে কী বিপুল লাভ করে চলেছে কোম্পানিগুলো। তাই বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না যে, দেশের সরকারটা চলছে আসলে দেশের ৯৯ শতাংশ জনগণের জন্য নয়, চলছে ১ শতাংশ লক্ষ কোটিপতি মালিকদের জন্য।

জনগণের উপর আর্থিক-বোমা ফেলেই চলেছে সরকার

- এ দেশে যে ঘাটতি-ঘাটতি বলা হয় তা তো খুব সহজেই কমিয়ে আনা যায় শুধুমাত্র কর্পোরেট ট্যাক্সে ছাড় কম দিলে। তার হিসাব তো বাজেটেই আছে। সরকার শিল্প মহলকে কর ছাড় দিয়েছে ৫ লক্ষ ২৯ হাজার ৪০২ কোটি টাকা। আর দেশের মোট আর্থিক ঘাটতি ৫ লক্ষ ২২ হাজার কোটি টাকা। শুধু কর্পোরেট কর নিলেই তো আর ঘাটতি থাকে না। ভরতুকিও তুলতে হয় না। বাড়ে না তেলের দাম, সারের দাম, খাবারের দাম।

  (বর্তমান ঃ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধ, ২৩/৩/২০১২)

- গত ১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে এক ধাক্কায় সারের উপর থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা ভরতুকি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়। বৈঠকে তৃণমূলের কেউ প্রতিবাদ করেনি। গত নয় মাসে প্রায় সব সারের দাম দ্বিগুণ হয়েছে।

  (বর্তমান ৪/৩/২০১২)

- সব থেকে বড় সমস্যায় পড়ল দেশের সাধারণ মানুষ। ঘাটতি কমাতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী আয় বাড়াতে চেয়েছেন। কিন্তু যেভাবে তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ২ শতাংশ হারে উৎপাদন শুল্ক বাড়ালেন এবং প্রতিটি পরিষেবায় ২ শতাংশ হারে পরিষেবা কর বাড়ালেন তাতে সর্বক্ষেত্রে দাম বাড়বে। কী হবে আর্থিক বৃদ্ধির উচ্চহারে দেশের অগ্রগতি দেখিয়ে, যদি না তা সব মানুষের কল্যাণেই লাগে?

  (বর্তমান ঃ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধ- ২৩/৩/২০১২)

- এবছর বাজেট পেশের কয়েকদিন আগেই ভারতীয় রেল ২০ শতাংশ হারে পণ্যমাশুল বাড়ায়।

  (আনন্দবাজার পত্রিকা-১০/৪/২০১২)

- এবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বাজেটে ঘুরপথে পরিষেবা করের নামে রেলের প্রথম শ্রেণি সহ সব ধরনের বাতানুকূল শ্রেণিতে ভাড়া বাড়ানোর রাস্তা প্রশস্ত করা সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রীয় বাজেটকে সহনীয় বলে প্রশংসা করল।

  (বর্তমান ঃ অতনু ভট্টাচার্যের নিবন্ধ -২৩/৩/২০১২)

- ''ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাক্স অন এন্ট্রি অব গুডস ইন টু লোকাল এরিয়াস বিল ২০১২'' নামে এই বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পর পণ্য প্রবেশ বাবদ সর্বোচ্চ পাঁচ শতাংশ হারে কর আদায় করতে পারবে। বিলের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রায় শ'তিনেক পণ্যের উপর এই কর চাপবে। তার মধ্যে খাদ্যবস্তু থেকে গৃহস্থালীর জিনিসপত্র, ইলেকট্রনিক গুডস এবং নানা ধরনের রাসায়নিকও আছে। আছে ইটপাথরও। ফলে গৃহ নির্মাণের খরচ বাড়বে। নতুন সরকার (তৃণমূল সরকার) দু'মাস আগেই ইট তৈরির মাটি এবং পাথর সহ নানা সামগ্রীর উপর চড়া হারে সেস, রয়্যালটি আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তখনও এইসব জিনিসের দাম একদফা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

  (বর্তমান ঃ ২৮/৩/২০১২)

- এর মধ্যে আবার এক শতাংশ হারে ভ্যাট বৃদ্ধি করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

  (একদিন ঃ ২/৪/২০১২)

- রাজ্য সরকার বলেছিল বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হবে না। কিন্তু ৫ মাসে ৪ বার বাড়ল বিদ্যুতের দাম।

  (বর্তমান ঃ ২১/৫/২০১২)

এ রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিকে কত ছাত্র সায়েন্স পড়ে জানেন?

উচ্চশিক্ষা দফতরের ২০০৯-'১০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন বলছে, এ রাজ্যের মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ১৪ শতাংশ উচ্চমাধ্যমিকে সায়েন্স পড়ে। কারিগরি শাখার শিক্ষার্থীদের যোগ করলে দেখা যায়, পরিমাণটা ২০-২১ শতাংশ। জাতীয় স্তরে এই গড় কত? ন্যাশনাল কাউন্সিল অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চ-২০০৪-এর রিপোর্ট বলছে, জাতীয় স্তরে এই গড় ২৫ শতাংশ। জাতীয় গড় পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে সামান্য বেশি হলেও তা আহামরি কিছু নয়। যে সামান্য পরিমাণ ছাত্র উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞানে ভর্তি হয় তারও আবার অতি সামান্যই কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। পাশ করেও অনেকে আসন সংখ্যার অপ্রতুলতার কারণে কলেজে অনার্স নিয়ে ভর্তির সুযোগ পায় না। এ দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার পরিসর অত্যন্ত সংকীর্ণ। দেশের মানুষের মনন জগতে যে এত কুসংস্কারের দুর্গ, দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তারের অভাব, বিজ্ঞান চেতনার অভাব নিঃসন্দেহে তার একটি বড় কারণ।

কেন এত কম ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান পড়ে?

এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে, এ রাজ্যে বা এ দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার পরিকাঠামোর যথেষ্ট অভাব। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪ হাজার ৬৫৩। এর মধ্যে ১৭৬৬টি স্কুলে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ১৯৭৩টি স্কুলে জীব বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ আছে। এই স্কুলগুলির অধিকাংশই আবার শহরে। জনসংখ্যার যে বৃহৎ অংশ গ্রামে বাস করে, সেখানে পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা আরও বেশি। অন্যদিকে বিজ্ঞান পড়া দিন দিন ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞানের সব বিষয় এবং বাংলা, ইংরেজিতে প্রাইভেট টিউশন পড়তে হচ্ছে। শুধুমাত্র স্কুলের পড়ানোর উপর ভরসা করে বিজ্ঞান পড়ে, এমন ছাত্র এখন খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। ফলে বিজ্ঞান পড়ার মেধাগত যোগ্যতা থাকলেও গ্রাম শহরের একটা বিরাট অংশের ছাত্রছাত্রী প্রবল দারিদ্রের কারণে বিজ্ঞান পড়তে পারে না। এই সত্যকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

শিক্ষার পরিকাঠামো যথাযথ ভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব কার? সরকারের। স্বাধীনতার ছয় দশকে অন্তত ১৫ বার বিভিন্ন দলের সরকার ক্ষমতায় এলেও শিক্ষাগত পরিকাঠামো পর্যাপ্ত সংখ্যায় নির্মাণের দায়িত্বটি যথাযথ ভাবে তারা কেউই পালন করেনি। প্রত্যেকেই ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জনস্বার্থ রক্ষার। অথচ সরকারে এসে বছর বছর ফি-বাড়িয়ে, বইপত্রের দাম বাড়িয়ে, শিক্ষাকে করে তুলেছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এরই পাশাপাশি পর্যাপ্ত শিক্ষকেরও রয়েছে অভাব। ক্লাসরুমে পর্যাপ্ত ও যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে টিউশন-নির্ভরতা অবশ্যই কমতো। সেক্ষেত্রেও সরকার উদাসীন।

বিজ্ঞান শিক্ষার পশ্চাদপদতার জন্য দ্বিতীয় যে কারণটিকে চিহ্নিত করা যায়, তা হল শিক্ষার দুর্বল ভিত্তি। সকলেই জানেন, বিজ্ঞানের সিংহদুয়ার হল অঙ্ক। অঙ্ক ছাড়া, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ই শুধু নয়, আর্টস ও কমার্সের কিছু শাখাতেও বেশি দূর এগোনো যায় না। অথচ এই অঙ্কেই রয়েছে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর দুর্বলতা। এই দুর্বলতার অন্যতম প্রধান কারণ হল প্রাথমিকে পাশফেল প্রথা তুলে দিয়ে অবাধ প্রমোশন নীতি চালু। শূন্য পেলেও পাশ করিয়ে দেওয়ার যে সর্বনাশা নিয়ম এ রাজ্যে সিপিএম সরকার চালু করেছে, এখন তার ফল হাতে হাতে ফলছে। শিক্ষার দুর্বল ভিত্তির জন্য বিষয়ের গভীরে ঢুকতে পারছে না অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী। তা ছাড়া, অঙ্ক, বিজ্ঞানের বিষয়গুলি বুঝতে গেলে যে ন্যূনতম ভাষাজ্ঞান প্রয়োজন, তা অর্জনেরও সুযোগ নেই এই ব্যবস্থায়। অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নবিধি আনা হয়েছে। রচনাধর্মী প্রশ্ন বাদ। এখন আর 'নিজের ভাষায় লেখ' প্রশ্ন করা হয় না। ফলে লেখার ক্ষমতা, চিন্তাকে সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রায় গড়েই উঠছে না। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন করায় ছাত্ররা বেশি নম্বর পেলেও ভাষায় থেকে যাচ্ছে দুর্বল, যে কারণে প্রশ্নে ঠিক কী চাওয়া হয়েছে তা বুঝতে বা ধরতে পারছে না অনেকেই। যাঁরা স্কুলে পড়ান বা প্রাইভেট পড়ান — এ তাঁদের প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা। ফলে পাশফেল প্রথা তুলে দিয়ে শিক্ষার ভিত্তি দুর্বল করে দেওয়া বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র কম আসার একটি অন্যতম প্রধান কারণ। এই কথাটি সত্য অন্যান্য শাখার ক্ষেত্রেও। এই অবস্থায় কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার যে ফরমান জারি করেছে তা কার্যকর হলে আগামী দিনে বিজ্ঞান সহ উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন শাখায় ছাত্র আসার হার আরও কমে যেতে বাধ্য।

কেন শিক্ষার প্রসারে সরকারের এমন হতাশাব্যঞ্জক ভূমিকা? অগ্নি-৫ উৎক্ষেপণ নিয়ে তো সরকারের উদ্যোগ ও অর্থের অভাব চোখে পড়ে না। দেশে বিজ্ঞান চেতনার অভাব শিক্ষাপ্রেমী মানুষের কাছে, সমাজসচেতন মানুষের কাছে মারাত্মক উদ্বেগজনক হলেও সরকারের কাছে কি তা উদ্বেগজনক নয়? যথার্থ বিজ্ঞান চেতনা মানুষকে যুক্তিবাদী করে। বিজ্ঞানের সঠিক উপলব্ধি দেখায় যে, সমস্ত ঘটনার পেছনে কার্য-কারণ সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটছে সবই ঈশ্বরের লীলা — ধর্মের, বেদ-বেদান্তের এই বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে কোন ঘটনার পেছনে কী নিয়ম কাজ করে। সমাজের ক্ষেত্রেও তা সত্য। একজন বিজ্ঞান চেতনার অধিকারী মানুষ সমাজের বা ব্যক্তিজীবনের নানা সংকটকে নিয়তি বা ভাগ্যের লিখন বলে ভাবতে পারেন না। তিনি সংকটের কারণ এই সমাজের মধ্যেই খোঁজেন। বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যুক্তিবাদী মানসিকতা, বস্তুবাদী মানসিক ধাঁচার প্রসার, তবে কি সরকার চায় না? একথা ঠিক সমাজের মধ্যেই সংকটের কারণ খোঁজার যে বিজ্ঞানসম্মত প্রয়াস, পুঁজিপতিশ্রেণি তাকে ভয়ের চোখেই দেখে। কারণ তারা জানে, এতে একদিন ধরা পড়বেই মানুষের জীবনের আজকের সংকটের মূলে রয়েছে বৈষম্যমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত পথে হেঁটে যেদিন তার সংকটের এই মূল কারণ ধরতে পারবে, সেদিন তার প্রতিকারের দাবিতে রাস্তায় নামবে। গড়ে তুলবে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের কর্মকাণ্ড। তবে কি সেই আন্দোলনভীতি থেকে পুঁজিপতিরা আজ আর বিজ্ঞান চেতনার প্রসারে গুরুত্ব দেয় না? ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে ওঠার প্রতিবন্ধক হিসাবেই কি শাসকশ্রেণি চায় কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, জাতপাত, ধর্ম-বর্ণ গত বিভেদ, পুরোমাত্রায় টিকে থাকুক! সেই কারণেই কি শাসক শ্রেণির তল্পিবাহক প্রতিটি সরকার প্রথমেই শিক্ষার ওপর আক্রমণ হানে!

তবে শাসক পুঁজিপতিরা বিজ্ঞান একেবারেই চায় না, এমন নয়। বিজ্ঞান পুঁজিপতিদের প্রয়োজন প্রযুক্তির জন্য, যাতে যন্ত্রের সাহায্যে কম শ্রমিক দিয়ে বেশি উৎপাদন করে মুনাফা বাড়াতে পারে। আর প্রয়োজন সমরাস্ত্র তৈরির জন্য, যে অস্ত্রের জোরে প্রভাব বিস্তার করে পুঁজিপতিরা অন্য দেশে বাজার দখল করে, নিজের দেশের মানুষকে শাসন করে। এর বাইরে বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বগত বিষয়ের প্রয়োজন পুঁজিপতিদের সামনে আজ আর বিশেষ কিছু নেই।

বিজ্ঞানের গবেষণা সংক্রান্ত খবরাখবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন, সরকারও বিজ্ঞানের তত্ত্বগত গবেষণার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে এই প্রযুক্তিগত গবেষণাতেই। তাছাড়া বিজ্ঞানের যতটুকু তাত্ত্বিক বিকাশ ঘটেছে সাধারণ মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও সরকারের বিশেষ উদ্যোগ নেই। এক একটি বিজ্ঞানের আবিষ্কার কীভাবে ধর্মীয় কুসংস্কারকে খান খান করেছে, বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কার প্রাত্যহিক জীবন ছাড়াও কীভাবে চেতনার জগতে পরিবর্তন এনেছে, দর্শন চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছে, সেসব জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার কোনও সরকারি আয়োজন নেই। বিজ্ঞান শিক্ষা বাস্তবিকই এখন চূড়ান্ত অবহেলার শিকার।

ফলে উচ্চমাধ্যমিকে যে মাত্র ১৪ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান পড়ে তা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

৩১ মে
সারা ভারত প্রতিরোধ দিবস

একের পাতার পর

বুঝতে এ দেশের সংগ্রামী মানুষের ভুল করলে চলবে না।

একই দিনে সিপিএম, সিপিআই যে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়েছে তাও কেবলমাত্র মুখরক্ষার প্রয়াস। এই দলগুলি বহুদিন ধরেই গণআন্দোলনের রাস্তাকে এড়িয়ে চলার মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করে জনসাধারণের পীড়নকারী পুঁজিপতি শ্রেণি এবং তার সেবাদাস সরকারের লেজুড়েই পরিণত হয়েছে।

‘ব্যয়সঙ্কোচ’ ঃ ধনীর পৌষমাস, গরিবের সর্বনাশ

একের পাতার পর

ব্যবস্থা কেন?

দেশজুড়ে যে আর্থিক-সংকটের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, অর্থমন্ত্রী তার জন্য দায়ী করেছেন ইউরোপের টালমাটাল আর্থিক অবস্থাকে। আমাদের দেশের আর্থিক টালমাটালের জন্য ইউরোপের পরিস্থিতি কতটুকু দায়ী? ক’দিন আগেই না অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, মহামন্দার ধাক্কায় গোটা বিশ্বে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠলেও ভারতকে তা আঘাত করতে পারবে না। তার কারণ নাকি ভারতের মজবুত অর্থনীতি। তা হলে অর্থমন্ত্রীর কোন কথাটা সত্যি? আগের কথাটা, না এখনকারটা? এই ক’দিনের মধ্যে দেশের অর্থনীতিতে কী এমন ঘটল যে সেই মজবুত অর্থনীতির ভিত ধসে পড়ল? এর আগেও গত শতকের ৯০-এর দশকের গোড়ায় বিশ্বায়ন তথা উদার অর্থনীতি চালু করার সময় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, তদানীন্তন নরসীমা রাও নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং প্রবল ঢক্কানিনাদে বলেছিলেন, বিশ্বায়নের নীতি অনুসরণের দ্বারাই আপামর ভারতীয় জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি ঘটবে। আর আজ তাঁরাই বলছেন, ভারতীয় অর্থনীতির দুরবস্থার জন্য দায়ী বিশ্বায়নের নীতি।

কেন মনমোহন সিং, প্রণববাবুদের এমন বলতে হচ্ছে? আসলে তাঁরা যে অর্থনীতি বয়ে নিয়ে চলেছেন, সেই অর্থনীতি আজ অচল হয়ে পড়েছে। সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদই যে এই সংকটের জন্য দায়ী, শোষণমূলক, বৈষম্যমূলক, মালিক-মজুরে বিভক্ত এই সমাজ যে আর কোনও সংকটেরই সমাধান করতে পারবে না এবং যতদিন এই ব্যবস্থা টিকে থাকবে ততদিন আরও বেশি বেশি সংকটের জন্ম দেবে, এই সত্যটি তাঁরা জনগণের থেকে আড়াল করতে চান। সেই জন্য তাঁরা যখন যেমন তখন তেমন কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যটি হাসিল করতে চান।

সরকারের মন্ত্রীরা পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে বারে বারেই এ জিনিস করেছেন। ৫০-এর দশকে যখন কংগ্রেস নেতারা ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের গায়ে সমাজতন্ত্রের তকমা বসিয়েছিলেন, তা ছিল দেশের মানুষের সাথে এক বিরাট প্রতারণা। তা ছিল পুঁজিপতিদের পুঁজিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে সমস্ত রকম রাষ্ট্রীয় সহায়তা দানের বিষয়টি সম্পর্কে জনগণকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা। স্বাধীনোত্তর কালে দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে ভারতীয় বাজারে বিদেশি পণ্য এবং বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ আটকাতে যে অতিরিক্ত শুল্ক এবং নানা বিধিনিষেধ চাপানো হয়েছিল, চার দশক পর যখন দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণি ভারতের জনসাধারণকে তীব্র শোষণের মধ্য দিয়ে অনেক শক্তিশালী হয়েছে, বিপুল পুঁজির অধিকারী হয়েছে, অন্য দেশের পুঁজির সাথে প্রতিযোগিতায় নামার মতো শক্তি সঞ্চয় করেছে, যখন শোষণ করতে করতে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তলানিতে এসে ঠেকেছে, দেশের মধ্যে পুঁজি বিনিয়োগের নতুন করে আর কোনও সুযোগ তারা পাচ্ছে না, তখন বিশ্বায়নের নীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে সেই শুল্ক প্রাচীর এবং বিধিনিষেধগুলি তুলে নেওয়া হল। অথচ বলা হল, জনগণের মঙ্গলই এই নীতির লক্ষ্য।

এই নীতির ফল কী হয়েছে?

শোষণ আরও তীব্র হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাজার আরও সংকুচিত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ শিল্পোৎপাদন ক্রমাগত মার খেয়েছে। সাধারণ মানুষ ক্রমাগত নিঃস্ব হয়েছে। লাখে লাখে কোটিতে কোটিতে তলিয়ে গেছে দারিদ্র সীমার নিচে, অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটির হিসাবে যাদের সংখ্যা প্রায় ৮৭ কোটি। অন্য দিকে গত দু’দশকে বিশ্বায়ন-উদারিকরণের নামে পুঁজিপতি শ্রেণি লুঠ করেছে সমস্ত জাতীয় সম্পত্তি। কল-কারখানা, খনি, নদী-সমুদ্র, বন-জঙ্গল, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, পথ-ঘাট সমস্ত কিছু। এইভাবে পুঁজির পাহাড় জমিয়েছে তারা। সমাজে ধনী-দরিদ্রের ফারাক দাঁড়িয়েছে আকাশ-পাতাল। এভাবে সম্পদ লুট করে এদেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বিশ্বের সেরা পুঁজির তালিকায় নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে।

আজ যখন অর্থনীতিতে সংকট আবার ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, যখন মন্ত্রীদের সমস্ত আশ্বাসবাণীকে উপহাস করে ফাটকার বাজার থেকে বিদেশি পুঁজি স্রোতের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে, পরিণামে টাকার দাম হু হু করে পড়ে যাচ্ছে, তখন রাজকোষ ঘাটতি কমানোর নাম করে আবার এই নিঃস্ব সর্বহারা মানুষগুলির উপরই ব্যয়সঙ্কোচের নামে নতুন করে বোঝা চাপাতে চলেছে কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার। যে আর্থিক সংকটের কথা বলা হচ্ছে তা কি সাধারণ মানুষ সৃষ্টি করেছে? এর জন্য তো দেশের জনগণ কোনওভাবে দায়ী নয়। এর জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি এবং তাদের স্বার্থরক্ষাকারী দল কংগ্রেস-বিজেপি পরিচালিত সরকারগুলি। তাদের নেওয়া একের পর এক জনবিরোধী নীতি ও পুঁজিপতি তোষণ নীতি দেশকে এই চরম সংকটজনক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। তবু আজ তারা সাধারণ মানুষের উপর বোঝা চাপিয়েই এই আর্থিক সংকট থেকে রেহাই পেতে চাইছে।

কিন্তু এর দ্বারাও কি তারা রেহাই পাবে?

আজ এখানে প্রণব মুখার্জী, মনমোহন সিংরা যা করতে চলেছেন, ঠিক একই কাজ করেছিলেন ফ্রান্সে সারকোজিরা, গ্রিসের ক্ষমতাসীন নেতারা, স্পেন, আয়ার্ল্যান্ডের শাসকরা। বলেছিলেন, ব্যয়সঙ্কোচ তথা সাধারণ মানুষ শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান প্রভৃতির জন্য সরকারি বরাদ্দ কমিয়ে, বেতন কমিয়ে, পেনশন বন্ধ করার পথেই একমাত্র এই সংকট থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। বাস্তবে সেই কৃচ্ছ্রসাধনের দিকেই দেশবাসীকে তাঁরা ঠেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে অর্থনীতির সংকটের কোনও সুরাহাই হয়নি। মানুষকে শুধু আরও দুর্ভোগের দিকেই ঠেলে দিয়েছে। ইউরোপের ১১টি দেশের সাধারণ মানুষ তাদের এমন সব রাষ্ট্রনেতাদের শাসনক্ষমতা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উচিত শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু এর থেকে শিক্ষা নেননি আমাদের দেশের সরকারি নেতারা। তাই তাঁরাও জনগণের ঘাড়ে ব্যয়সঙ্কোচের বোঝা চাপানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু মানুষ তাঁদের এই ভাঁওতা কিছুতেই মেনে নেবে না। তাদের চোখের সামনে রয়েছে গ্রিস সহ আমেরিকা ইউরোপের এই ব্যয়সঙ্কোচ নীতির ব্যর্থতার উদাহরণ। ফলে দেশের সর্বত্রই সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ তাদের এই চূড়ান্ত জনবিরোধী ব্যয়সঙ্কোচ নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে।

বাস্তবিক এটি কোনও একটি দেশের বিশেষ দলের বিশেষ নীতির ফল নয়। পুঁজিবাদী যে কোনও দেশে যারাই যখন ক্ষমতায় থেকেছে, তারাই এই একই নীতি নিয়ে চলেছে। আমাদের দেশেও যখন বিজেপি ক্ষমতায় থেকেছে, এমনকী যখন কংগ্রেস-বিজেপির মতো মার্কা মারা বুর্জোয়া দলগুলিকে বাদ দিয়ে অন্য আঞ্চলিক বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া এবং সিপিআই, সিপিএমের মতো মেকি মার্কসবাদী দলগুলি নিয়ে তৈরি যুক্তফ্রন্টও ক্ষমতায় থেকেছে তারাও একই নীতি নিয়ে চলেছে। রাজ্যে রাজ্যে সিপিএম, লালুপ্রসাদ, জয়ললিতা, মায়াবতী, নবীন পট্টনায়ক, যাঁরা যেখানে ক্ষমতায় থেকেছে তাঁরা সেখানে এই একই নীতি নিয়ে চলেছেন। আসলে

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সৌজন্যে

এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে এই সংকটের সমাধান সম্ভব নয়। যারাই এই সংকটগ্রস্ত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চাইবে, যারাই এই চরম দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণির সেবা করবে, তারাই একের পর এক এমন চরম জনবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপ নিয়ে চলবে। অর্থনীতির এই সংকট, জনগণের এই চরম দুর্ভোগ আসলে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখারই পরিণাম।

ইউ পি এ সরকারও এই আয়ু ফুরিয়ে যাওয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে গিয়েই দেশের সাধারণ মানুষের উপর একের পর বোঝা চাপিয়ে চলেছে। পুঁজিপতি শ্রেণির তৈরি করা সংকটকে দেশের আপামর সাধারণ মানুষের সংকট হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করছে। ব্যয়সঙ্কোচের নামে আবারও সেই ‘যথার্থ উন্নয়নের’, ‘আখেরে কল্যাণের’ ধোঁকাবাজি দিয়ে চলেছে। যুক্তির খাতিরে এই সংকটকে যদি যথার্থই ‘গোটা সমাজের সংকট’ হিসাবে মেনে নেওয়াও হয়, তবে সেই সঙ্কটের মূল্য শুধু দেশের সাধারণ মানুষ চোকাবে কেন? কেন শুধু তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য খাদ্যের ন্যূনতম অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হবে? কেন দেশের ধনী, পুঁজিপতি শ্রেণির গায়ে হাত দেওয়া হবে না? কেন এক বারও বলা হচ্ছে না যে, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা যা সরকার ‘স্টিমুলাসের’ নামে, ‘প্যাকেজের’ নামে দিয়ে চলেছে, এই সংকট সৃষ্টিতে যার অবদান কোনও অংশে কম নয়, সেগুলি তুলে নেওয়া হবে? কেন বলা হচ্ছে না, পুঁজিপতিরা যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে চলেছে, তার সমস্ত কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেওয়া হবে? কেন শুধু গত তিন বছরে ব্যাঙ্কে কোটিপতিদের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা? কেন তাদের ঋণ মকুবের পরিমাণও প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা? কেন বলা হচ্ছে না, এই সংকটের সময়ে এই সমস্তই সরকার উশুল করে নেবে? পরিস্থিতি যদি এতখানি সংকটজনকই হয়ে থাকে তবে কেন এই পরিস্থিতিতেও বড় বড় কোম্পানিগুলির ব্যালান্স সিটে হাজার হাজার কোটি টাকার মুনাফার অঙ্ক জ্বলজ্বল করছে? কেন এই সরকারই সাংসদদের বেতন এক ধাক্কায় ২০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮০ হাজার টাকা করে দিল? কেন মন্ত্রীরা লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা চুরি করেও হাসতে হাসতে জেল থেকে বেরিয়ে আসছে? সত্যিই যদি সরকার এই সংকট নিয়ে সিরিয়াস হত, তবে দেশের হাড় জিরজিরে গরিব সাধারণ মানুষের উপর এই সংকটের বোঝা চাপানোর আগে পুঁজিপতিদের এই চুরি দুর্নীতি বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নিত।

শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি, তাদের প্রসাদপুষ্ট উপদেষ্টামণ্ডলী, এবং তাদের পরিচালিত সংবাদমাধ্যমগুলিও এই বোঝা দেশের সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষে জোর সওয়াল করে চলেছে। তাঁদের ভাবনা, এত দিনের মতো এবারও যদি এই মানুষগুলোর ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে এই সংকট থেকে উদ্ধার হওয়া যায়। তারা দেখেছে বারবার প্রতারিত হয়েও যুগ যুগ ধরে এই মানুষগুলো সমাজের সব বোঝা কীভাবে মুখ বুজে টেনে গেছে। শাসক কংগ্রেস স্বাধীনতার নামে এদের সাথে প্রতারণা করেছে, বিজেপি ধর্মের নামে প্রতারণা করেছে, মায়াবতী-লালুপ্রসাদ প্রমুখেরা জাতপাতের নামে প্রতারণা করেছে, সিপিএম বামপন্থার নামে প্রতারণা করেছে। তারা ভেবেছে, যে কোনও প্রতারণাই এমন করে চিরকাল এরা মুখ বুজে সয়ে যাবে। কিন্তু গোটা বিশ্বে কোথাওই আজ আর মানুষ মুখ বুজে মালিক শ্রেণির শোষণ নিপীড়ন মেনে নিচ্ছে না। কারণ, পেট বড় বালাই। সর্বত্রই মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমাদের দেশেও সাধারণ মানুষ, চাষি, শ্রমিক সকলেই প্রস্তুত হচ্ছে নতুন লড়াইয়ের জন্য, প্রস্তুত হচ্ছে কল-কারখানায়, জমিতে, বস্তিতে, স্কুল কলেজে সর্বত্র। তাদের পণ— এ লড়াইয়ে তারা জিতবেই।

যাত্রী পরিবহণে সুব্যবস্থার দাবিতে ডেপুটেশন

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিবহণ যাত্রী কমিটি যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য সহ সাত দফা দাবিতে ১৫ মে আন্দোলনে নামে। ছাত্রছাত্রী, ব্যবসাদার, কৃষিজীবী, চাকুরিজীবী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে প্রতিদিন বাস, ট্রেকার, অটোরিক্সা সহ পরিবহণের বিভিন্ন মাধ্যমে যাতায়াত করতে হয়। প্রশাসনের চূড়ান্ত গাফিলতিতে এবং নজরদারির অভাবে জেলার রাস্তাঘাটগুলি চলাচলের অযোগ্য। তাছাড়া বাস ও ট্রেকার চালকরা যাত্রী পরিষেবায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করায় যাত্রী নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য ভীষণভাবে অবহেলিত। বাড়ছে দুর্ঘটনা, যাত্রী-পথচারীদের মৃত্যু। এই অব্যবস্থা অবিলম্বে নিরসনের দাবিতে এদিন যাত্রী কমিটি জেলাশাসক, আর টি এ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং পি ডব্লু ডি আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মধুসূদন মান্না, প্রভঞ্জন জানা, তপন জানা, জয়দেব মহাপাত্র, জগদীশ মুখার্জী প্রমুখ।

স্মারকলিপিতে রাস্তায় মোবাইল চেকিং, ঘাটালে মোটর ভেহিকেল দপ্তর চালু, বাসে অধিক প্যাসেঞ্জার বহন বন্ধ করা, বাসরুটের সম্প্রসারণ, রাস্তা সংস্কার, সমস্ত বাসে সিনিয়র সিটিজেন, মহিলা, শিশু এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সিট সংরক্ষণ এবং সপ্তাহের সব দিন ছাত্রছাত্রীদের কনসেশন দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

বিশ্বায়ন ঃ
কী পেল সাধারণ মানুষ

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা থেকে শুরু করে তামাম দেশনেতার দল, সরকারি প্রসাদে পুষ্ট নামীদামি অর্থনীতিবিদ এমনকী সংবাদমাধ্যমের একদল কলমচি পর্যন্ত প্রবল চিন্তিত যে, ভারতবর্ষ নাকি বিশ্বায়নের সুফল আত্মসাৎ করার কাজে ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছে। বহুল প্রচারিত দৈনিক ঘন ঘন প্রবন্ধ লিখে আক্ষেপ করছে— গোটা দুনিয়া বিশ্বায়নের হাত ধরে তর তর করে এগিয়ে চলেছে, শুধু এই পোড়া দেশেই ভোটের দিকে তাকিয়ে 'জনমোহিনী পদক্ষেপ' নিতে গিয়ে কর্তাব্যক্তিরা সাহসী হতে পারছেন না! আর্থিক সংস্কার করতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছেন!

কেমন যেন আশ্চর্য লাগে! বিশ্বায়ন, আর্থিক সংস্কার যদি মানুষের জন্যই হয় তবে তো সাধারণ মানুষ দু'হাত তুলে একে স্বাগত জানাবে। ভোটের বাজারে বুক ফুলিয়ে নেতারা বলবেন, আমরা আর্থিক সংস্কার করেছি, তেল, গ্যাস, সারের দাম বাড়িয়েছি, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিলগ্নিকরণ করেছি, খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশের অবাধ সুযোগ করে দিয়েছি ইত্যাদি 'উন্নয়নের' কথা। কিন্তু এমন তো হয় না! নেতারা ঠাণ্ডা ঘরে বসে কর্পোরেট মালিকদের সঙ্গে ছক কষেন আর্থিক সংস্কারের। আর মাঠে ময়দানে জনসাধারণকে বলেন গরিব মানুষের জন্য তাঁদের দরদের কথা। বলেন দাম কমবে, একটু ধৈর্য ধরো। তখন বিশ্বায়ন থাকে ঝুলির ভিতরে গোপন অ্যাজেন্ডা হয়ে। ভোটের বাজারে জনগণ ভুল বুঝতে পারে ভেবে বিশ্বায়নের এমন মহান বাণী নেতারা ঢোঁক গিলে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হন কেন?

আসলে বিশ্বায়নের এই নীতি তৈরিই করা হয়েছে মেহনতি মানুষের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও শুষে নিয়ে পুঁজিপতিদের মুনাফার ভাণ্ডার আরও ভরিয়ে তুলতে। বিশ্বায়নের ফর্মুলা পুঁজিপতি শ্রেণি নিয়ে এসেছে এমন একটা সময়ে যখন বিশ্বজোড়া বাজার সংকটে পড়ে গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা ধুঁকছে। '৯০-এর দশকের শুরুতে এই সংকট থেকে ত্রাণ পেতে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লু টি ও) এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আই এম এফ) বিশ্বায়নের রূপরেখা প্রস্তুত করে। অপেক্ষাকৃত ছোট দেশগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করা হয় আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম কানুন তুলে দিয়ে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পণ্যকে দেশের বাজারে প্রবেশের অবাধ সুযোগ করে দিতে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে যাবতীয় পরিষেবা এবং খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, জল, জমি সহ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে লগ্নির ক্ষেত্র হিসাবে উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি চাপ সৃষ্টি করে। বাণিজ্যের স্বার্থে সমস্ত পরিষেবা ক্ষেত্র জনকল্যাণমূলক খাতে সরকারি দায়িত্ব ক্রমাগত কমিয়ে বৃহৎ মালিকদের বেশি বেশি করে ট্যাক্স ছাড়, অনুদান, বিনা সুদে ঋণ, ঋণ মকুব ইত্যাদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যে সমস্ত দেশ এগুলি করতে কিছুটা হলেও দ্বিধান্বিত ছিল তাদের উপর নেমে আসে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের খাঁড়া। বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদের বাঁচার এই মরীয়া লড়াইয়ের নামকরণ হয় বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যার রূপ অর্থনীতির উদারীকরণ।

আমাদের দেশে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহকে বলা হয় এই উদার অর্থনীতির রূপকার। তিনি সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন 'কাউকে না কাউকে এই অপ্রিয় কাজটি করতেই হত'। অপ্রিয় কাদের কাছে? অপ্রিয় সাধারণ মানুষের কাছে, কিন্তু স্বাগত একচেটিয়া মালিকদের তরফে। বিশ্বায়নের মহিমায় ভারতের একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ভারতীয় ধনকুবেররা বিশ্বের প্রথম দশজন ধনীর তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এ দেশের শেয়ার বাজারে দেশের ৪ শতাংশ মানুষের বিনিয়োগের পরিমাণ ১ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার। অন্যদিকে দেশের ১২০ কোটি লোকের মধ্যে ৮৩.৬ কোটি মানুষ দিনে ২০ টাকার নিচে আয় করে।

বিশ্বায়নের পরিকল্পনা অনুযায়ী যে দেশের পুঁজির জোর যত বেশি সেই দেশ অন্যান্য দেশে তত বেশি লগ্নি করতে পেরেছে। যার ক্ষমতা কম সেই দেশ লুণ্ঠিত হচ্ছে বেশি। তার প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমশক্তি বিপুলভাবে লুণ্ঠিত হচ্ছে— যেমন আফ্রিকা। আবার বিশ্বায়ন উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশের জনজীবনের মানও ক্রমাগত তলানিতে নামিয়ে এনেছে, আগে যা ভাবা যেত না। দেখা যাচ্ছে গোটা বিশ্বেই ধনী গরিবের বৈষম্য ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়েছে। এক দিকে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ফুলে ফেঁপে উঠছে, অপর দিকে বেড়েছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। বিশ্বায়নের পক্ষে যারা ওকালতি করে তাদের হিসাবেই আমেরিকা ইউরোপের মানুষের জীবন যাত্রার মান নেমে গেছে পূর্বতন এশিয়া আফ্রিকার মানের স্তরে। এশিয়া, আফ্রিকার মানও নেমেছে। আফ্রিকার দেশে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে মৃত্যু হচ্ছে হাজার হাজার মানুষের। এশিয়ার প্রায় সর্বত্রই বেড়েছে দারিদ্র, অনাহার।

বিশ্বজোড়া প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠের বাজার সৃষ্টি করেছে বিশ্বায়ন। কয়লা, তেল গ্যাসের মতো খনিজ সম্পদ দখল করার জন্য যে কোনও পদক্ষেপ নিতে সাম্রাজ্যবাদীরা আজ পিছপা নয়। পানীয় জল হয়ে উঠেছে বাণিজ্যের মহার্ঘ পণ্য। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্র বিনিয়োগের সবচেয়ে লোভনীয় জায়গাগুলির মধ্যে অন্যতম। এর বিষময় ফল বর্তাচ্ছে মানব সমাজের সর্বত্র। শিক্ষার মর্মবস্তু, মানুষ গড়ার প্রক্রিয়ার বদলে শিক্ষা হয়ে উঠেছে মুনাফার হাতিয়ার। আমেরিকা, ইউরোপেও চিকিৎসা করাতে অক্ষম মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে শিশুমৃত্যুর হার। ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে আমেরিকায় চিকিৎসা এবং অন্যান্য অবহেলাজনিত কারণে শিশুমৃত্যুর হার সর্বাধিক। আমাদের দেশের সরকারি কর্তারাও স্বীকার করছেন যে চিকিৎসা করাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

বিশ্বের সর্বত্র বেপরোয়া লুণ্ঠন চালিয়েও পুঁজিবাদের সংকট কিন্তু কাটেনি। কারণ সর্বোচ্চ মুনাফার লোভে অনবরত শ্রমিক ছাঁটাই, মজুরি হ্রাস ও পদ অবলুপ্ত করে কর্পোরেট পুঁজি বিশ্বের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা নিঃশেষিত করে দিয়েছে। দেশে দেশে এস ই জেড তৈরি করে শ্রমিক শোষণ আরও তীব্র করেছে। বৃহৎ পুঁজি সরকারি মদতে একটা কারখানা খুললে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আরও দশটা কারখানা। ভারতের শীর্ষ বণিক সংগঠন সি আই আই পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছে, দেশে ভোগ্যপণ্যের ক্রেতা কমছে। আমেরিকা ইংল্যান্ডের শ্রমিক কর্মচারিদের প্রকৃত আয় কমেছে ভয়াবহ ভাবে। কৃষিক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজির অবাধ অনুপ্রবেশের ফলে ধ্বংস হচ্ছে দেশে দেশে কৃষির স্বাভাবিক বৈচিত্র্য। গোটা বিশ্বেই কৃষকরা চূড়ান্ত শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট। ভারতে প্রতি তিরিশ মিনিটে একজন কৃষক আত্মহত্যা করছে।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে গোটা পৃথিবীর কোটি কোটি সাধারণ মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে — বিশ্বায়ন তাদের জীবনে ডেকে এনেছে বিপর্যয়। তীব্র সংকটের মধ্যে পুঁজির মালিকরা সর্বোচ্চ লাভের আশায় বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে যাচ্ছে সস্তা শ্রম খুঁজতে। তাই বিশ্বের কোনও দেশেই কোনও চাকরিরই স্থায়িত্ব আজ আর নেই। কর্মক্ষেত্রে ৮ ঘণ্টা কাজের ধারণা এখন সুদূর অতীত। এই 'উদার' বিশ্বে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে আমেরিকায় এক বছর আগের চেয়ে বর্তমানে কাজের ঘন্টা বেড়েছে বছরে এক সপ্তাহ। ১৯৭০ সালের নিরিখে তা বছরে পাঁচ সপ্তাহ বা তার চেয়ে বেশি। সব দেশেই একজন শ্রমিক কর্মচারিকে একাধিকবার সংস্থা বা চাকরির স্থান বদল করতে হচ্ছে। ফলে কোথাও তার থিতু হওয়ার উপায় নেই। চারপাশে তাকালেই বোঝা যায় ভারতও একই পথের পথিক।

এই পরিস্থিতিতে সব চেয়ে বেশি সংকটাপন্ন হচ্ছে পরিবারগুলির শিশু-কিশোররা। নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে বাবা-মা দু'জনেই দিনরাত পরিশ্রম করছেন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। তাঁদের উপায় নেই সন্তানকে দু-দণ্ড সময় দেওয়ার। টানা কাজ, বিভিন্ন শিফটে কাজের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে না। বাবা-মায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য না পেয়ে, জীবনের চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা ও প্রবল প্রতিযোগিতার পরিবেশে কোনও রকমে টিকে থাকার চেষ্টায় ছুটতে ছুটতে অসংখ্য শিশু আজ মানসিক অবসাদে আক্রান্ত। এই সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। এরই প্রতিফলন ঘটছে গত পাঁচ বছরে আমেরিকায় স্কুলের মধ্যে গুলি করে সহপাঠীদের হত্যা করার ২৫টি ঘটনায়। ভারতেও প্রায় রোজই বাড়ছে কিশোর অপরাধীর সংখ্যা।

বৃহৎ সংস্থার পদাধিকারীদের সন্তানরাও মা-বাবার বিশেষ সঙ্গ পাচ্ছে না। তাদের বেশিরভাগ সময় কাটে ক্রেসে। এদের মধ্যে যারা একটু বড় তাদের সময় কাটে টিভির থ্রিলার দেখে। ফলে তাদের কাছে অনুসরণীয় চরিত্র হয়ে উঠছে অবাস্তব ফিল্মি হিরোরা। সম্প্রতি কলকাতাতেও নাইট ক্রেস চালু হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মী পিতা-মাতারা তাঁদের সন্তানকে নাইট ক্রেসে রেখে কাজে যাচ্ছেন। শুধু কাজের প্রয়োজনে নয়, তাদের জীবন উপভোগের অন্যতম উপাদান নাইট ক্লাবে যেতে হলেও সন্তানদের ক্রেসে রাখছেন তাঁরা। অনেক সময় বাচ্চাদের একটানা তিন-চারদিন ক্রেসে কাটাতে হয়। সাংবাদিকরা বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছেন, মা-বাবা ও পরিজনের সান্নিধ্য না পেয়ে তাদের মানসিক স্থিরতার ব্যাঘাত ঘটছে, নানা অস্বাভাবিকতা দেখা দিচ্ছে আচরণে। পরিবারের প্রতি, বাবা-মায়ের প্রতি কোনও আকর্ষণই তৈরি হচ্ছে না। সাধারণ মানুষের জন্য এই উপহারই এনেছে বিশ্বায়ন। সমাজ এ পথে চলতে থাকলে অচিরেই কী পরিস্থিতি হতে যাচ্ছে ভাবলেও আতঙ্ক হয়।

ভারতের মতো দেশে পরিবারের বন্ধন এতদিন অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়ে এসেছে সমাজের সর্বস্তরেই। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাব পরিবারের মধ্যেও ভাঙন ধরিয়েছে। দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ এই বিষয়গুলি কর্পোরেট জগতের আলোতে, লাভ-লোকসানের মাপকাঠিতে ফেলে বিচার করার ফলে পারিবারিক সম্পর্ক নিছক আর্থিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। গ্রিস, ইতালি ইত্যাদি ইউরোপীয় দেশ যেখানে পারিবারিক বন্ধন বিশেষ মর্যাদা লাভ করত, সেখানেও আজ সন্তানকে অনাথ আশ্রমে রেখে আসতে মা-বাবারা বাধ্য হচ্ছেন পরিবারের অন্যদের বাঁচাতে। বিশ্বায়ন যে তীব্র আর্থিক সংকট সাধারণ পরিবারে নিয়ে এসেছে, তা সমস্ত বন্ধনকেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। আমাদের দেশে হাইকোর্টকে বলতে হচ্ছে পিতা-মাতার ভরণ পোষণ এবং দায়িত্ব সন্তানকে নিতে হবে।

বিশ্বায়নের হাত ধরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মতোই ভয়াবহ আক্রমণ এসেছে নীতি-নৈতিকতা সংস্কৃতির উপরে। দেশ কাল অনুসারে সংস্কৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য মুছে দিয়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে কর্পোরেট দুনিয়ার ব্যবসার উপোযোগী 'খাও পিও জিও'র ভোগবাদী সংস্কৃতি। এর অন্যতম হাতিয়ার হয়েছে বিজ্ঞাপন। বড় বড় কর্পোরেট কোম্পানির বিজ্ঞাপন প্রস্তুত হয় মূলত শিশু থেকে বয়ঃসন্ধিকালের ছেলে-মেয়েদের লক্ষ্যবস্তু ধরে। কারণ ছোটদের আব্দার অনুযায়ী জিনিস কেনার প্রবণতা বেশিরভাগ পরিবারেই থাকে। তাই দিনরাত টিভি এবং অন্যান্য মাধ্যমে ছোটদের সামনে কোম্পানিগুলি তুলে ধরে— অমুক ব্র্যান্ডের পোশাক, তমুক ব্র্যান্ডের খেলনা ইত্যাদি ব্যবহার না করলেই চলবে না। ক্রমাগত এই প্রচার দেখতে দেখতে ছোটরা এর মধ্যে বুঁদ হয়ে যায়। নিজের চারপাশের সমস্ত কিছুকে মনে হয় আকর্ষণহীন সাদামাটা। আমেরিকার একটি সমীক্ষক দল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিশু-কিশোরদের নিয়ে গবেষণা করে বলেছেন, এই বিজ্ঞাপনের সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব হল এখনকার ছোটরা কোনও কিছুতেই খুশি হয় না। তাঁদের মতে এই ভোগবাদী সংস্কৃতির জন্ম দেওয়াই হয়েছে বিশ্বজুড়ে জিনিস বেচার লক্ষ্যে। কারণ কোনও একটা কিছুতে খুশি হলে দ্বিতীয় জিনিস বিক্রির বাজার নষ্ট হবে। এভাবে কোনও কিছুতেই সন্তুষ্ট না হওয়ার ফলে মোবাইল ফোন থেকে জামা-কাপড়, চুলের কায়দা বা প্রসাধন এ সব কিছুই তারা ক্রমাগত বদলাতে থাকে। শেষপর্যন্ত নিজেকেও ভালো না লাগার ফলে ভেঙে পড়ে চূড়ান্ত অবসাদে। কোনও মতেই সন্তুষ্ট না হওয়ার, ক্রমাগত অতৃপ্তিতে ভোগার এই মানসিকতা এবং তার সঙ্গে আরও বেশি বেশি ভোগের লিপ্সা তাদের মধ্যে অস্থিরতার জন্ম দিচ্ছে। ফলে বাড়ছে নেশা করার প্রবণতা। এ দেশে স্কুল কলেজের ছাত্র বা যুবকদের হাতে মহিলাদের শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ উদ্বেগজনক ভাবে বেড়েছে। বয়ঃসন্ধির সময় থেকে যুবক পর্যন্ত এই প্রজন্মের একটা বড় অংশের মধ্যে কোনও নীতি আদর্শের পরোয়া না করার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা তাদের এই দিকে আরও ঠেলে দিচ্ছে।

আলো ঝলমলে শপিং-মলে কলরোল করে ঘুরে বেড়ায় যে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীরা, বেশভূষা যত উজ্জ্বলই হোক না কেন, তাদের অনেকেই দিন কাটায় নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে। মনের গভীরে স্নিগ্ধ গভীর কোনও আলোর দিশা নেই তাদের। তাই নাইট-ক্লাবের উদ্দাম নাচ-গান আর নেশার মধ্যে কেউ নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চায়, কেউ বেছে নেয় আত্মহননের পথ। যারা বেঁচে থাকে, গোটা সমাজ থেকে, পারিবারিক পরিবেশের মধুর উত্তাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজের উপর একরাশ বিতৃষ্ণা নিয়ে জীবনের কোনও মানেই খুঁজে পায় না তারা। এমন প্রজন্ম আজ সব দেশেই সৃষ্টি হচ্ছে যাদের কোনও বন্ধু নেই, যারা ছোট থেকে চারপাশের সকলকেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে। স্নেহ মায়া মমতায় ভরা পরিবারের সুখ তাদের কাছে নিতান্তই অধরা। সাধারণ মানবিক বোধগুলির সন্ধানও তারা পাচ্ছে না। মরণোন্মুখ পুঁজিবাদী সমাজের টিকে থাকার মরিয়া প্রচেষ্টার দাম এমন করেই জুগিয়ে চলেছে বিশ্বের মানুষ।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

সকল রাজবন্দির মুক্তির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

সিপিএম সরকারের আমলে ধৃত ও সাজাপ্রাপ্ত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির দাবিতে ও বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে ২২ মে রানি রাসমণি রোডে কমিটি ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস অ্যান্ড সেকুলারিজম (সিপিডিআরএস)-এর পক্ষ থেকে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিধায়ক তরুণ নস্কর, ছোটন দাস, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক প্রণব অপূরিত। ইতিমধ্যেই অনেকটা সময় গড়িয়ে গিয়েছে। কারা প্রাচীরের অন্তরালে তাঁদের জীবনের মূল্যবান সময় — কারও ১২ বছর, কারও ১৫ বা ১৮ বছর অতিক্রান্ত। প্রতিটি মুহূর্ত তাঁদের কাছে দুর্বিষহ, ভয়ঙ্কর।

সভা চলাকালীন ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করে। তাতে স্মরণ করিয়ে

দাশগুপ্ত, সভাপতি ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত ও সহসভাপতি ডাঃ অশোক সামন্ত বক্তব্য রাখেন।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সিপিএম সরকারের আমলে যেভাবে হাজার হাজার প্রতিবাদী মানুষকে পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশে কারারুদ্ধ করা হয়েছে বক্তারা তাকে ধিক্কার জানান। তাঁরা বলেন, বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। এস ইউ সি আই (সি) দলের ন'বারের বিধায়ক প্রবীণ নেতা প্রবোধ পুরকাইত, প্রফুল্ল মণ্ডল, সুন্দর চ্যাটার্জী এবং ছত্রধর মাহাতো, পতিত পাবন হালদার সহ বিভিন্ন দলের ৫৬ জন নেতা-কর্মী যাবজ্জীবন কারদণ্ডে দণ্ডিত। তাঁরা আরও বলেন, বর্তমান সরকার সিপিএম ফ্রন্টের অপশাসনের বিরোধিতা করেই ক্ষমতাসীন হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এটা প্রত্যাশিত যে, গণআন্দোলনের নেতা-কর্মী যাঁরা আজও কারান্তরালে রয়েছেন, তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তির মধ্য দিয়ে এই সরকার জনসাধারণের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততার প্রমাণ দেবে। কিন্তু সে প্রত্যাশা আজও দেওয়া হয় যে, মুখ্যমন্ত্রী রাজবন্দিদের মুক্তির প্রশ্নে মাননীয় বিচারপতি মলয় সেনগুপ্তকে চেয়ারম্যান করে রিভিউ কমিটি গঠন করেছিলেন। সি পি ডি আর এস-এর পক্ষে ৫৬ জন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত রাজবন্দি সহ দেড় হাজার মিথ্যা মামলার যাবতীয় তথ্য রিভিউ কমিটির নিকট পেশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সংবাদপত্র মারফৎ এমন কিছু খবর প্রকাশ পেয়েছে যা থেকে বন্দিদের পরিবারের মধ্যে প্রিয়জনের মুক্তির প্রশ্নে বিশেষ আশার সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু মুক্তির বিষয়ে দীর্ঘসূত্রীতা তাঁদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

আরও উদ্বেগের বিষয় যে, সিপিএম সরকারের আমলে খুন, জখম, লুঠ, ধর্ষণ, বিরোধীদের গৃহে অগ্নিসংযোগের মতো ক্ষমাহীন অপরাধের সাথে যুক্ত পুলিশ প্রশাসনের অনেকেরই কোনও শাস্তি হয়নি, তাঁরা বহাল তবিয়তে অবস্থান করছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সহ রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা এই ঘটনায় মর্মাহত। সি পি ডি আর এস দাবি জানিয়েছে, আর কালবিলম্ব না করে সরকার দ্রুত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তি দিক।

অন্ধ্রপ্রদেশের রেল দুর্ঘটনা উদ্বেগজনক

২২ মে শেষ রাতে অন্ধ্রপ্রদেশের পেনুকোণ্ডা স্টেশনে বাঙ্গালোরগামী হাম্পি এক্সপ্রেস এবং দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে কমপক্ষে ২৫ জন যাত্রীর প্রাণহানি এবং বহু মানুষের আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৩ মে এক বিবৃতিতে বলেন,

আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি যে, এই ধরনের রেল দুর্ঘটনা নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে শত শত মূল্যবান জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। যাত্রী নিরাপত্তা সংক্রান্ত জরুরি কাজগুলি রেল কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করার ফলেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ঘনঘন এ ধরনের দুর্ঘটনা সত্ত্বেও রেল কর্তৃপক্ষ এখনও নিরাপত্তার প্রশ্নে উদাসীন ঢিলেঢালা মনোভাব নিয়ে চলছে, যা আমাদের উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলছে। কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার-২ এবং বিশেষত তাদের রেল দপ্তর 'অ্যান্টিকলিশন ডিভাইস' সহ আধুনিক সিগন্যাল ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধের নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে না। যাত্রী নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও উন্নতি দূরে থাক, রেল ভ্রমণ যাত্রীদের কাছে ক্রমাগত আতঙ্কের হয়ে উঠছে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ দাবি করেন, এই দুর্ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করতে হবে এবং দোষী রেল কর্মচারীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। নিহত ও আহত যাত্রীদের পরিজনকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও তোলেন তিনি। সাথে সাথে তিনি বলেন, জড়তা, অকর্মণ্যতা ঝেড়ে ফেলে এই মুহূর্তে তাদের সক্রিয় হওয়া জরুরি, যাতে আরও বহু মানুষের মূল্যবান জীবন বাঁচানোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা যায়।

মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করায় কলেজ ছাত্রী বিপন্ন

ডি এস ও-র খোলা চিঠি

রাজ্যে তৃণমূল সরকারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি টি ভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে এক ছাত্রী প্রশ্ন করায় সেই ছাত্রীর নিরাপত্তা বিপন্ন বলে সংবাদ প্রকাশ পাওয়ায় ছাত্রসংগঠন এ আই ডি এস ও-র পক্ষ থেকে রাজ্য সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই ২৫ মে মুখ্যমন্ত্রীকে নিচের খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন—

মহাশয়া, আমরা ছাত্রসংগঠন এ আই ডি এস ও-র পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত একটি সংবাদে উদ্বিগ্ন হয়ে বিষয়টির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ১৮ মে একটি সর্বভারতীয় চ্যানেলে (সি এন এন-আই বি এন) আপনার সাথে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নোত্তরভিত্তিক একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আপনি ক্ষোভের সঙ্গে বেরিয়ে যান বলে সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। প্রশ্নকারীদের মধ্যে একজন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী তানিয়া ভরদ্বাজ ইতিমধ্যেই খোলা চিঠিতে আপনাকে জানিয়েছেন যে, তিনি এই ঘটনার পর থেকে নিরাপত্তার অভাব অনুভব করছেন এবং তিনি এ রাজ্য ছেড়ে বিদেশেও চলে যেতে পারেন।

কোনও বিষয় সম্পর্কে আপনার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়ার পর কেউ নিরাপত্তার অভাব অনুভব করবেন, এটা কখনই কাম্য নয়। তাই, আমাদের অনুরোধ, আপনি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন এবং ছাত্রীটি যাতে নিরাপদে তাঁর উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেন, সে বিষয়ে যথাযথ কার্যকরী ভূমিকা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

জেল ব্যবসা

তিনের পাতার পর

এই সব বন্দিদের মানবিক অধিকার সংক্রান্ত কোনও কথাই কারাগুলির বেসরকারিকরণ সংক্রান্ত দলিলপত্রে আদৌ উল্লিখিতই হয়নি। তাই আশঙ্কা এইসব একচেটিয়া কোম্পানিগুলির কাছে কারাগারগুলি তাদের চাহিদামতো পুরোপুরি বিক্রি হয়ে গেলে তাদের সর্বগ্রাসী লোভের কোপে পড়ে সেখানে বন্দি মানুষগুলোর ন্যূনতম মানবাধিকারেরও যে কী দশা দাঁড়াবে! দয়া, মায়া, মানবিকতা, মূল্যবোধ, এসবের কানাকড়িও মূল্য নেই মুনাফাবাজ জেল ব্যবসায়ীদের কাছে। কীভাবে সর্বোচ্চ লাভ অর্জন করা যায়, তাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। এই হচ্ছে আজকের যুগের পুঁজিবাদী পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের 'স্বর্গরাজ্য' আমেরিকার চেহারা ও চরিত্র।

পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

কলকাতা

আমেদাবাদ

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in